Vol. 52 | No. 2 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ও নজরুল সংগীত

Volume	52
Issue	2
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সন্তোষকুমার ঢালী
Published online	February 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i2.10
Pages	১৪৭-১৮৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ও নজরুল সংগীত

Check for updates

সন্তোষকুমার ঢালী*

চর্যাপদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের বাংলা গান পর্যন্ত বিভিন্ন সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের গানে বিষয়ের যে বৈচিত্র্য, তা অন্য কারো গানে নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা গানের বিকাশ ও সমৃদ্ধির ধারায় অন্যতম প্রধান হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম। এছাড়াও বাংলা গানকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, নতুন সুর ও রীতির প্রবর্তন করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত, দাশরথি রায়, হাসন রাজা, লালন ফকির, কাঙাল হরিনাথ, গগন হরকরা, রাধারমণ, বিজয় সরকার প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের গানেই রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। গানের বিষয়, সুর ও আবেদনে রয়েছে স্বকীয়তা। রামপ্রসাদ শুধু শ্যামাসংগীত রচনা করেছেন। হাসন রাজা, লালন ফকির লোকসংগীত বা বাউল গান রচনা করেছেন। বিজয় সরকারের গানের বিষয় আধ্যাত্মিকতা ও বিচ্ছেদী। এঁদের প্রত্যেকের গানই প্রধানত একটি বিষয় নির্ভর করে রচিত। ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্ত। নজরুল প্রসঙ্গে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন —

> সংগীতজ্ঞ নজরুল বাংলা সংগীতের আনুমানিক সহস্র বৎসরের ইতিহাসে সবচেয়ে সৃজনশীল মৌলিক সংগীত প্রতিভার অধিকারী, বাণী ও সুরস্রষ্টা। সংখ্যাধিক্যের কারণেই নয় বরং বাংলা সংগীতের প্রায় সব কয়টি ধারার পরিচর্যা এবং বাংলা গানকে উত্তর ভারতীয় রাগসংগীতের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে তিনি লোকসংগীত-ভিত্তিক বাংলা গানকে উপমহাদেশের বৃহত্তর সংগীত-ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। নজরুল সংগীত বাংলা সংগীতের অণুবিশ্ব, তদুপরি উত্তর ভারতীয় মার্গ-সংগীতের খাঁটি বঙ্গীয় সংস্করণ। বাণী ও সুরের বৈচিত্র্যে নজরুল বাংলা গানকে মধ্যযুগীয় সংগীতের অনুসৃতি থেকে আধুনিক সংগীতে রূপান্তর ঘটান। আধুনিক বাংলা কবিতার মতো আধুনিক বাংলা গানেরও পথিকৃৎ কাজী নজরুল ইসলাম। (রফিকুল, ২০১১ : ৭)

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে সংগীত রচনার ক্ষেত্রেই নজরুলের কৃতিত্ব বেশি। তিনি ছিলেন অসাধারণ সংগীতস্রষ্টা ও সুরস্রষ্টা। বলা যায় আধুনিক সংগীতের পথদ্রষ্টা। প্রাথমিক যুগের বাংলা চলচ্চিত্রে নজরুলের গান এক বিশাল স্থান দখল করেছিল। বাংলায় সার্থক গজল রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। তিনি তাঁর গানে বিদেশি, বিশেষ করে আরবীয় সুরের ছোঁয়া এনেছেন। রাগভিত্তিক সংগীত রচনা করেছেন। নজরুলের স্বকালে এবং বর্তমান কালে তাঁর গান অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তিনি সাধারণ মানুষের, বাঙালির মনের কথাটি প্রাণের সুরটি ধরতে পেরেছেন। এর প্রধান কারণ, তাঁর গানে লোকজ শব্দ এবং লোকজ সুরের ব্যবহার। সংগীতে লোকজ উপাদান ব্যবহারের ফলে তা বেশি করে মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কলেজ।

নজরুল সংগীতের একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে লোকজ উপাদান। তাতে ঐতিহ্যের ছাপ স্পষ্ট। বাল্যে লেটোর দলের সাথে সম্পৃক্ততা তাঁর লোকসংস্কৃতির ভিত তৈরিতে সহায়ক হয়েছিল :

> লেটোর দলকে কেন্দ্র করেই কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত ও কাব্য প্রতিভার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে ; এখানেই একই সঙ্গে বিচিত্র বিষয়ে গান রচনায় তাঁর হাতেখড়ি। লেটোর দলের জন্য পালা রচনা করতে গিয়ে মুসলিম ও হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ঘটে। তিনি একদিকে যেমন মুসলিম জীবন ধারা থেকে কাহিনী ও গীত রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন, অপরদিকে হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যানের পটভূমিতেও পালাগান রচনা করেন। তাঁর সে সময়কার রচনায়ই এই দুই ঐতিহ্যস্রোতের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের পরবর্তীকালের বহু রচনায় মুসলিম ও হিন্দু ঐতিহ্যের যে অসামান্য সহাবস্থিত রূপটি প্রকাশ পেয়েছিল, তার সূচনা ঘটে এই পর্বে। তাছাড়া লেটোর দলের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে তিনি বর্ধমান অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়েরও সুযোগ পেয়েছিলেন। সে অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত ঝুমুর গানের সঙ্গে সে সময়ই নজরুলের পরিচয় ঘটে। পরবর্তীকালে ঝুমুর অঙ্গে বহু গান রচনা করেছিলেন তিনি। (করুণাময়, ১৯৯০ : ১৪০)

এছাড়াও পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে বা অঞ্চলে ঘুরেছেন এবং অবস্থান করেছেন। সেসব অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে তাঁর মনে। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রকাশই ঘটেছে তাঁর নানা গানে। তাঁর গান তাই এত বিচিত্রগামী, এত বৈচিত্র্যময়।

লোকজ উপাদান বলতে বুঝায় চিরায়ত বাংলার মাটি ও মানুষের প্রাণের ছোঁয়া আছে যাতে, সেই সব বিষয়কে। গ্রাম্যজীবন, প্রকৃতি আর পল্লি মানুষের মনের কথা — এ তিনটি উপাদান নিয়েই লোকজ ঐতিহ্য। বাংলার মানুষের আবহমানকালের বিশ্বাস, ধর্মচর্চা, পূজা, পার্বণ, উৎসব, কৃষ্টি এসবই লোকজ উপাদান। কৃষক, জেলে, তাঁতি, মাঝি, কামার, কুমোর, নানা শ্রেণির গ্রাম্য সমাজের সকল শ্রমজীবী মানুষের প্রাণের আর্তি, হৃদয়ের আরতিরই প্রকাশ লোকজ উপাদানে। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল, ধামাইল, কীর্তন, মুর্শিদি, গম্ভীরা, গাজন, বিয়ের গান, টুসুর গান, ঝুমুর গান ইত্যাদি দেশজ গানে লোকজ বিষয় বর্তমান। আলোচনার সুবিধার জন্যে মোটামুটিভাবে লোকজ উপাদানের একটা রূপরেখা তৈরি করে নেয়া যেতে পারে। এগুলোর মাধ্যমে লোকজ বিষয়কে শণাক্ত করা যায়। ১. লোকমানুষ, ২. লোকজীবন, ৩. লোকবিশ্বাস, ৪. লোকসংস্কার, ৫. লোকাচার, ৬. লোকউপকরণ, ৭. লোককারিগরি, ৮. লোকশিল্পকলা, ৯. লোকবিজ্ঞান, ১০. লোকচিকিৎসা, ১১. লোকউৎসব, ১২. লোকপার্বণ, ১৩. লোকপূজা, ১৪. লিখনকেন্দ্রিক ফোকলোর, ১৫. লোকখেলাধুলা, ১৬. লোকমেলা, ১৭. লোকবাদ্যযন্ত্র, ১৮. লোকনৃত্য ইত্যাদি লোকজ উপাদান। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো —

১. লোকমানুষ

নজরুলের স্বকালে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ সারা ভারতে তেমনভাবে ঘটে নি। শহরগুলো বাদ দিলে সারা ভারতবর্ষই ছিল গ্রাম। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মন্বন্তর, মহামারী ইত্যাদি ছিল গ্রামের মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশবিপ্লব এসবের প্রভাব পড়েছিল সারা ভারত জুড়ে। ইংরেজ শাসন এবং শোষণ ছিল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। সবকিছু মিলিয়ে কঠিন

এক দুঃসময় গেছে মানুষের জীবনে। নজরুলও সেই সময়ের, সেই সমাজেরই একজন মানুষ। মুক্তিকামী বাঙালি সৈনিক। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সাধারণ মানুষের জীবন, দুঃখ, কষ্ট, গ্লানি। মিশেছেন তাদের সাথে, আত্মস্থ করেছেন তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি। পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকা ধুলোর মতো জীবন থেকে খুঁজে নিয়েছেন নানা লোকজ উপাদান-উপকরণ। প্রয়োগ করেছেন তাঁর সাহিত্যে; সংগীতে, কবিতায়, নাটকে। লোকমানুষ লোকজ উপাদানের প্রাথমিক শর্ত। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মন্বন্তর, মহামারীপীড়িত এইসব গ্রাম্য মানুষেরাই লোকমানুষ। কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে, বেদে, কৃষক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষকে লোকমানুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নজরুলের গানে এসব মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায় ব্যাপকভাবে।

তাঁর 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'জেলেদের গান', 'কুলি মজুর', 'সাম্যবাদ' প্রভৃতি কবিতা ও গানে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি, দরদ ও ভালোবাসা বাণীমূর্তি লাভ করেছে। (হারুন, ১৯৯৬ : ৭)

নিচে বেশ কিছু গানের উল্লেখযোগ্য কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হলো। মাঝি, মাল্লা, বাগদি, ডোম, চামার, মেথর, চাঁড়াল, নাপিত, বামুন, বেদে, রাখাল, বাউল, হাড়ি, শূদ্র, চাষী, গোপিনী, বৌ, সতিন, মিনসে ইত্যাদি লোকমানুষের উল্লেখ রয়েছে তাঁর গানে। উল্লেখ রয়েছে এঁদের কর্ম ও জীবনপ্রণালির, পরিচয় রয়েছে তাদের ক্ষুদ্র জীবন-পরিধির। নীচতা, হীনতা, তুচ্ছতা ইত্যাদি জড়িয়ে রয়েছে তাদের সারা অঙ্গে। রয়েছে বেঁচে থাকার সংঘ ও সংগ্রামের প্রত্যয়। নজরুল ছিলেন এদের আত্মার আত্মীয়। তাই তাঁর গানে এরা পেয়েছে যোগ্য মর্যাদা। স্মরণ করা যাক নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা —

১.১
এ তরীর কাণ্ডারী আহমদ, পাকা সব **মাঝি ও মাল্লা,**
মাঝিদের মুখে সারী-গান শোন্ ঐ — লা শরীক্ আল্লাহ্!
(*চন্দ্রবিন্দু* : ৪২)

১.২
ধুচ্‌নি মাথায় হাতে ধামা
দেখে মোদের রসিক-রাজ —
ডোমের জাতি ভেবে — দিলেন
ডোম্‌নি ক'রে মাতায় আজ ॥
(কমিক গান : ডোমিনিয়ন স্টেটাস্, *চন্দ্রবিন্দু*)

১.৩
শ্যামা তুই **বেদেনীর** মেয়ে
(তাই) মাঠে ঘাটে বেড়াস ধেয়ে।
(*বন-গীতি* : ৪৮)

১.৪
জবু-থবু জাতকে নিয়ে এ ত দেখি বিষম ল্যাঠা,
পথ চল্‌তে গেলেই দেখি শুভ্র অজাত বেজাত ঠ্যাটা,
মেথর চাঁড়াল ডোম হাড়ি সব মাল নিয়ে যায় কাঁচি পাকি ॥

গরুর গাড়ি চড়তে গিয়ে দেখি **শূদ্র** চালায় গাড়ি,
হুঁকোতে টান দিতে গিয়ে জল ফেলে দিই তাড়াতাড়ি।
রেলগাড়িতে **বামুন শূদ্রে** মাছে শাকে মাখামাখি ॥

'**মথরানী**টা বললে, 'বাবু, জাত জান কি তোমার মায়ের?
পাঁচ ছেলের সে ময়লা ফেলে, আমি ফেলি লক্ষ ছেলের!
স্নান করে সে ঠাকুর পূজে, আমার বেলায় জাতের ফাঁকি ॥

ছোঁওয়া-ছুঁয়ি বাঁচিয়ে বাঁচি ভূ-ভারতে কেমন করে,
অব্রাহ্মণ **ম্লেচ্ছ চাঁড়াল** আষ্টেপিষ্ঠে আছে ভরে,
এমন করে ক'দিন চালাই জাতের ছেঁড়া কাপড় ঢাকি ॥
(*গীতি-শতদল* : ১০১)

১.৫

ভাঁটির শীর্ণা নদীর কূলে
আমার রবি-ফসল দুলে,
নবান্নেরই সুঘ্রাণে মোর
চাষীর মুখে টপ্‌পা গাওয়ায় ॥
(*গানের মালা* : ৫৬)

১.৬

বাঁকা ছুরির মতন বেঁকে
উঠলো যে তোর আঁখি রে।
ওরে **বেদের** দুলাল আমার সাথে
সাপ খেলাবি না কি রে ॥
তোর জোড়া ভুরুর ধনুক আমি চিনি,
পাখি আমি নই, বেদিয়া, আমি যে সাপিনী।
(*কবিতা ও গান* : ৮২০)

২. লোকজীবন

নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের জীবনই লোকজীবন। গ্রামীণ সমাজের নীচুতলার মানুষ, যারা নাগরিকতা থেকে দূরে, শ্রমের সাথে সম্পৃক্ত, গোষ্ঠীবদ্ধ আচার-প্রথায় বিশ্বাসী — তাদের জীবনকেই লোকজীবন বলা হয়। অন্ত্যজ শ্রেণির দারিদ্র্যপীড়িত অবহেলিত মানুষের সামগ্রিক জীবনাচরণ দিয়েই লোকজীবন বিচার করা হয়ে থাকে। ব্রাত্য মানুষের সামগ্রিক জীবনচিত্র তথা তাদের আচার, প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার, উৎসব, পার্বণ সবকিছুই লোকজীবনের বিষয়। লোকমানুষ এবং লোকজীবন পৃথক কিছু নয়। একে অন্যের পরিপূরক। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ মূলত লোকজীবন-নির্ভর। এদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। রয়েছে জেলে সম্প্রদায়। এছাড়াও তাঁতি, মাঝি এবং অন্যান্য বহু পেশার মানুষ রয়েছে যারা গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত। এদের জীবন-যাপনপ্রণালিই লোকজীবন।

নজরুলের গানে লোকজীবনের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে বহুস্থানে, বহুভাবে। মাঝি স্নান-ঘাটে নৌকা বাঁধে, কৃষক মাঠে মাঠে চারাধান রোপণ করে, জেলে জাল ফেলে মাছ ধরে, চাষা মাঠে কাজ করে, কুমার হাঁড়ি গড়ে, বাউল গান গায়, রাখাল মাঠে গরু চরায়, চুড়িওয়ালা চুড়ি বিক্রি করে, শ্রমিক ছাদ পেটায়, বেদেনি সাপের নাচ দেখায় — ইত্যাদি লোকজীবনের অনুষঙ্গ গভীর মমতায় শিল্পিত হয়েছে নজরুলের গানে। এসব অনুষঙ্গ ব্যবহারে নজরুলের শুধু স্বদেশপ্রীতিরই পরিচয় মেলে না, লোকজীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকজীবনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি। নজরুল তা সাহিত্যে স্থান দিয়ে বিশ্বসাহিত্য সভায় হাজির করেছেন। মাটি থেকে উঠে আসা এইসব প্রসঙ্গ সব মানুষের আত্মার খোরাক যোগায়। তাই তাঁর গান এত জনপ্রিয়। লোকজীবনের প্রসঙ্গ রয়েছে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য পঙ্‌ক্তি নিচে দেয়া হলো :

২.১
ও দুঃখের বন্ধু রে, ছেড়ে কোথায় গেলি।
আমি **লবণ দিতে পান্তা ভাতে হলুদ দিয়ে ফেলি** ॥
তোর লাঙল তোর কাস্তে নিয়ে
আমি খুঁজে বেড়াই মাঠে গিয়ে,
আমার **চোখের জলে মাঠ ভেসে যায়**
তুই তবু কই এলি ॥
(বন-গীতি : ৩৬)

২.২
(তুই) বলহীনের বোঝা বহিস্ যেথায় ভৃত্য হয়ে
শ্রমিক চাষার তরে যথা আঁধার খাদে মাঠে
ক্ষুধার অন্ন নিস্ মা বয়ে, নে মা তাদের হাটে
(রাঙা-জবা : ৫০)

২.৩
ঐ বাঁধা-ঘাটে, ঐ বালুচর,
মাটির প্রদীপ, ঐ মেটে ঘর
চেনে মোরে ঐ **তুলসীতলার নববধূ ননদিনী** ॥
(বুলবুল ২য় খণ্ড : ৮৫)

২.৪
গাঙে জোয়ার এল ফিরে, তুমি এলে কই।
খিড়্‌কি দুয়ার খুলে পথ-পানে চেয়ে রই ॥

চুল বেঁধে আর সেজে গুজে পিদিম জ্বালাই সাঁঝে,
ঠাকুরঝিরা মুচকি হাসে, আমি মরি লাজে।
(বুলবুল ২য় খণ্ড : ৯০)

২.৫
হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে এনে দে নৈলে **বাঁধব না বাঁধব না চুল**।

কুস্‌মি রং শাড়ি চুড়ি বেলোয়ারি
কিনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে
বাব্‌লা ফুল আমের মুকুল ॥
(কবিতা ও গান : ৩৫)

২.৬
লাল নটের ক্ষেতে লাল টুকটুকে বৌ যায় গো
(তার) আল্‌তা পায়ের চিহ্ন একে নাল্‌তা শাকের গায় গো ॥

কাঁকাল বাঁকা রাখাল ছোঁড়া আগ্‌লে দাঁড়ায় আল —
রাঙা বৌয়ের চোখে লাগে লাল লঙ্কার ঝাল।
বৌয়ের ঘেমে ওঠে গা
লাজে সরে না পা
সে মুখ ফিরিয়ে শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়ায় গো ॥
(কবিতা ও গান : ৪২)

২.৭
মোরা চাষ করি এই মাঠের বুকে, চাষ করি এই মাটি।
যে মাটির বুকে রহে পাকা সোনার ধানের কাঠি ॥

আশ মেটে না চারা ধানের পানে চেয়ে চেয়ে,
মরাই-ভরা থাকবে ওরা আমার ছেলেমেয়ে;
চাই না স্বর্গ, পাই যদি ওই পাকা ধানের আঁটি ॥

মেটে ঘরের দাওয়ায় বসে স্বপন দেখি রেতে,
পুবাল্‌ হাওয়া ঢেউ দিয়ে যায় আমন ধানের ক্ষেতে,
সেই মাটির মধু মাঠে আসে হয়ে ভাতের বাটি ॥
(কবিতা ও গান : ২৩৫)

২.৮
এই মাঠ আর মাটি তোদের দুধের কপিল গাই;
মাটি তোদের মা, আর মাঠ আমাদের ভাই।
কাপাস বুনে এই মাটিতে দেশের কাপড় পর্‌ ॥
(কবিতা ও গান : ২৩৬)

২.৯
সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো
পেট ভরে ভাত পাই না, ধরে আসে হাত গো ॥
তোর ঘরে আজ কি রান্না হয়েছে,
ছেলে দুটো ভাত পায়নি, পথ চেয়ে রয়েছে।
আমিও ভাত রাঁধিনি, দেখ্‌ না চুল বাঁধিনি,
শাশুড়ি মান্ধাতার বুড়ি মন্দ কথা কয়েছে।
আমার ননদ বড় দজ্জাল, বজ্জাত গো ॥
(কবিতা ও গান : ৮৩২)

২.১০
আমরা বেদেনী গো, পাহাড় দেশের বেদেনী।
গলার ঘ্যাগ, পায়ের গোদ, পিঠের কুঁজ,
বের করি দাঁতের পোকা, কানের পুঁজ;
. . . . . .
বাঁশের কুলো, বেতের ঝাঁপি, পিয়াল পাতার টুকি।
নাও ওগো বৌ, হবে খোকা-খুকি ॥
নাচ, নাচ, নাচ — **বেদের নাচ? সাপের নাচ?**
সোলেমানী পাথর নেবে? রঙিন কাচ?
(সংগীতাংশ, *গীতিবিচিত্রা*)

৩. লোকবিশ্বাস

কোনো বিশ্বাস সংহত সমাজের মানুষের মনে স্থান করে নিলে তাকে লোকবিশ্বাস বলে। 'ইংরেজী Folk belief শব্দটিকে বাংলায় Translation loan-এর মাধ্যমে করা হয়েছে লোক-বিশ্বাস।' (বরুণ, ২০০৩ : ১৯) অসহায় মানুষ নির্ভরতা চায়। কোনো অলৌকিক শক্তিকে আশ্রয় করে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চায় বা বিপদমুক্ত থাকতে চায়। জগৎ ও জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কার্যকারণ যখন ব্যাখ্যার অতীত হয়ে দেখা দেয়, তখন লোকবিশ্বাসের জন্ম হয়। অজ্ঞতা ও অন্ধতার ফলেই সমাজে লোকবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় :

> বস্তু বা বিষয়গুণের ধারণা থেকে বিশ্বাসের জন্ম হয়। বস্তু বিষয়ে কার্যকারণ সম্পর্কে প্রতীতি যখন সত্য ও বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তখন তা বিশ্বাসের অঙ্গ হয়েও জ্ঞান নামে অভিহিত। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত মন যখন বস্তু, ভাব, বিষয় বা ঘটনার গুণধর্মে অমূলক অবস্থায় স্থাপন করে এবং তার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে তখনই এক একটি অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম হয়। (খালেক, ১৯৮৫ : ২৮১)

মানুষ যখন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা বুদ্ধির দ্বারা ঘটে যাওয়া কার্যের কারণ খুঁজে না পায় তখনই মনগড়া বিশ্বাস তৈরি করে নেয়। কারণ, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। এই অন্ধ বিশ্বাসই লোকবিশ্বাসের জন্ম দেয়। 'কোন কোন সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অযৌক্তিক ব্যাখ্যা কিংবা কোন সময় নৈসর্গিক নিয়ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতার ফলেই সমাজে নানা লোক-বিশ্বাসের উদ্ভব হয়।' (আশুতোষ, ২০০৫ : ৪৭)

লোকবিশ্বাস কোনো ব্যক্তি মানুষের একক বিশ্বাস নয়। ক্রমে ক্রমে কোনো বিশ্বাস সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এক সময় সমাজের সব মানুষ তা মেনে নেয়, এভাবেই লোকবিশ্বাসের জন্ম হয়। যুক্তিহীন অসহায় হৃদয়ই লোকবিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। পৃথিবীর সব দেশে, সব সমাজে, সব কালে, সব ধর্মেই লোকবিশ্বাসের প্রচলন রয়েছে। শিক্ষা বা আধুনিকতার সাথে এর কোনো বিরোধ বা ঐক্যসূত্র নেই। শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় শ্রেণির মানুষের মনেই লোকবিশ্বাসের সৃষ্টি হতে পারে। বহু রকমের লোকবিশ্বাস থাকে সমাজে। পেঁচার ডাককে অমঙ্গলসূচক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, পাখির অমঙ্গল ডাক শুনলে নিজের অথবা পরিবারের অকল্যাণ হয়, পুত্রসন্তান না হলে মানুষ স্বর্গচ্যুত হয়, পুং নামক নরকবাস

হয়, কাউকে ডাকতে গেলে সামনের দিক থেকে ডাকা উচিত, পেছন থেকে ডাকা অশুভ বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে, সাপকে আঘাত দিলে রাতে সে ঘরে এসে কামড়ায় — এ জাতীয় বহু লোকবিশ্বাস সমাজে প্রচলিত। (দ্র. বরুণ, ২০০৩ : ২৫)

> লোকবিশ্বাসের চরিত্র যেমন বিচিত্র, তার সংখ্যাও তেমনি অজস্র। অনেক বিশ্বাস আজ কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত কুসংস্কারের বহুল ব্যবহার বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। কেবল যেসব ধর্ম আজ অপ্রচলিত হয়ে গেছে অথবা যেসব ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সংখ্যা নগণ্য কেবল সেইসব ধর্মেই যে কুসংস্কারগুলো স্থিত আছে এমন নয়, বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের মধ্যেও লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কার নানাভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। পৃথিবীর কোন ধর্মই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে, সেই ধর্মে কোন লোকবিশ্বাস বা কুসংস্কার নেই। কোন কোন ধর্মের মৌলিক বিধানে লোকবিশ্বাস এবং কুসংস্কার তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম থাকতে পারে, কিন্তু সেই ধর্ম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ফলে আঞ্চলিক লোকবিশ্বাস এবং কুসংস্কার সেইসব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে তাদের কর্মকাণ্ডে, আচার-আচরণে এবং উৎসব-পার্বণে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। (মযহারুল, ১৯৯৩ : ৮৪)

নজরুল লোকবিশ্বাসের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন কি না, তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে সংস্কৃতির উপাদানের প্রতি তার যে আগ্রহ ও দায় ছিল, তাঁর গানের প্রতিটি পরতে পরতে এই চিত্র বা প্রতিবেদন পাওয়া যায়, যেমন — 'এই চুড়ি পরলে হাতে রাঙা বর পায় যত আই-বুড়ি', 'মদনকুমার নাম রাখিও এই কবচ লও', 'কালো মেয়ে হবে তার স্বামীর প্যারী'।

নজরুলের অনেক গানে এ ধরনের লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ রয়েছে। নিচের ৩.১ নম্বর গানে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের কথা আছে। ৩.২ নম্বর গানে আছে যাদুর চুড়ি ও কবচের কথা — এ চুড়ি হাতে পরলে 'কালো মেয়ে হবে তার স্বামীর প্যারী', 'বশ হয় ননদ শাশুড়ি', 'রাঙা বর পায় যত আই-বুড়ি'। ৩.৩ নম্বর গানে মন্ত্রের সাহায্যে সাপের বিষ নামানোর লোকবিশ্বাসের কথা আছে — 'খা খা খা , তোর বক্ষিলারে খা। বিষহরি শিবের আজ্ঞে, দোহাই মনসা, আমায় যদি কামড়াস খাস জরু-কারুর হাড়।' ৩.৪ নম্বর গানে আছে 'কবচ' পরলে পুত্রসন্তান জন্মানোর লোকবিশ্বাসের কথা। এসব লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ গানে ব্যবহারের ফলে গান হয়েছে অকৃত্রিম এবং সাধারণ মানুষের একান্ত নিজস্ব বিষয়। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় —

৩.১
ও বাঁশের বাঁশি রে,
সই এ জনমে মিটলো না সাধ
হলাম না তার দাসী,
বলিস্ তারে **আর-জনমে**
হই যেন তার বাঁশি।
(কবিতা ও গান : ৮০৯)

৩.২
মিলনের রাখি কাচের এ চুড়ি;
কালো মেয়ে হবে তার স্বামীর প্যারী ॥
যাদু জানে এই চুড়ি.

বশ হয় ননদ শাশুড়ি,
এই চুড়ি পরলে হাতে রাঙা বর পায় যত আই-বুড়ি।
(কবিতা ও গান : ৮১২)

৩.৩
সাপুড়িয়া রে! বাজাও কোথায়
সাপ খেলানোর বাঁশি!
কালিদহে ঘোর উঠিল তরঙ্গ
কালনাগিনী নাচে বাহিরে আসি'!
(বুলবুল ২য় খণ্ড : ৭৬)

গানের শুরুতে নিচের কথাগুলো সাপুড়েদের মন্ত্র-পড়ার ঢং-এ আবৃত্তি করা হয়েছে —

> খা খা খা, তোর বক্ষিলারে খা। তারি দিব্যি ফণাতে তোর যে ঠাকুরের পা। বিষহরি শিবের আজ্ঞে, দোহাই মনসা, আমায় যদি কামড়াস খাস জরু-কারুর হাড়। নাচ নাগিনী ফণা তুলে, নাচ রে হেলেদুলে। মারলে ছোবল বিষ দাঁত তোর অমনি নেব তুলে। বাজ তুবরী বাজ ডমরু বাজ, নাচরে নাগ-রাজ। (নূরুল, ১৯৯৭ : ২৬৩)

৩.৪
মদনকুমার নাম রাখিও এই না কবচ লও
(এই) কবচ রানীর গলায় বাইন্দ্যা পুত্রের আশায় রও।
কইব কি সে দুঃখের কথা, সোনার ছাওয়াল লইয়া
পাতালপুরীর মাঝে রাখল পাগল হইয়া।
(তৃতীয় অঙ্ক, *মধুমালা*)

৪. লোকসংস্কার

সংহত কোনো জনগোষ্ঠী যে বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণ এবং কার্যকে কর্তব্য-অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, তাই হল লোকবিশ্বাস। আর সেইসব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে সংহত জনগোষ্ঠী শুধু বিশ্বাসই করে না, ব্যবহারিক জীবনে তা মেনেও চলে, তা হল লোকসংস্কার :

> সংস্কার মূলত বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত, বিশ্বাসের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু এগুলি সচেতনভাবে সৃষ্ট নয় এবং সর্বাংশে বিজ্ঞানভিত্তিক নয় কিংবা বৈজ্ঞানিক মানসিকতার দ্বারা পরীক্ষিত নয়, তাই একই উপাদানের ব্যবহারগত প্রতিক্রিয়া কিংবা একই আচরণ অথবা অনুষ্ঠানের পরিণাম ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে। (বরুণ, ২০০৩ : ৪৩)

মানুষের মনের অন্ধ বিশ্বাস থেকেই সংস্কারের সৃষ্টি হয়। সমাজে কোনো বিশ্বাস প্রচলিত থাকে যে, এই করলে মঙ্গল বা এই করলে অমঙ্গল — যার সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই এবং সেই অনুযায়ী মানুষ তা পালন করে, তখন তাকে সংস্কার বলে। একটা জনগোষ্ঠী যখন এই রীতিকে বিশ্বাস করে তখন তা লোকবিশ্বাস এবং যখন তা পালন করে তখন তা লোকসংস্কার। এর মূলে রয়েছে যুক্তি-তর্কহীন বিশ্বাস। 'সংস্কারের মূল যে ভিত্তিহীন বিশ্বাস তাতে সন্দেহ নেই।' (বরুণ, ২০০৩ : ১৭) শৈশব থেকে দেখতে দেখতে

শুনতে শুনতে কোনো বিশ্বাস বা সংস্কার মনের গভীরে দৃঢ়মূল ছায়া বিস্তার করে। পরবর্তী জীবনের শিক্ষাও তাকে দূর করতে পারে না। শিক্ষিত মনও অমাবস্যা রাতে তেঁতুলতলা দিয়ে যেতে ভয় পায়, যাত্রার সময় পেছন থেকে ডাকলে বাধা মনে করে। 'কতগুলো লোকবিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়ে জীবনযাত্রার পথে স্থায়ী ও প্রথাগত স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রমে এগুলো মনের গভীরে স্থান পায়। আচরণসিদ্ধ, প্রথাবদ্ধ বিশ্বাসের এ স্তরকে আমরা সংস্কার নাম দিতে পারি।' (খালেক, ১৯৮৫ : ২৮১)

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সংস্কার বিভিন্ন রকমের হতে পারে। নজরুল ইসলামের গানেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, মাথায় হাত দিয়ে 'কিরা' কাটার প্রচলন বাংলার সর্বত্রই রয়েছে। নজরুলের গানেও উল্লেখ রয়েছে। 'মানুষ গেলে ফিরে না কি দিলে মাথায় কিরে', বিরক্তির বশে থুক দেয়ার যে প্রচলন আছে, সেই দৃষ্টান্ত রয়েছে যেমন, 'সেদিন অন্ন জোটে না তার, তার মুখে দেয় থুক'। এ ধরনের সংস্কার নজরুলেও বিদ্যমান। তবে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের একপ্রকার ঐক্য আছে :

> দেশভেদে কালভেদে সংস্কারের বিভিন্নতা যেমন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি সংস্কারের বৈচিত্র্য এবং এর অবলম্বিত উপাদানগুলিও আমাদের মনোযোগ দাবি করে। আহার্য, বাসস্থান, পরিচ্ছদ কিংবা আশা-আকাঙ্ক্ষা, রঙিন স্বপ্ন, ব্যর্থতাজনিত গ্লানি, বৈষম্যজনিত বেদনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সর্বকালীন মানুষের মধ্যে একপ্রকার ঐক্যের সন্ধান যেমন পাই, তেমনি সংস্কারের জগতেও আমরা বিশ্বমানবের ঐক্যের সন্ধান পাই। অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা; নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ঐকান্তিক বাসনা যেখানে, সেখানেই কমবেশি সংস্কারের আধিপত্য। নিছক নিরক্ষর বা অশিক্ষিত মানুষের সঙ্গেই সংস্কারের সম্পর্ক এ ধারণা যথার্থ নয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, এশিয়া-ইউরোপ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কিংবা সাদাচামড়া-কালোচামড়া নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল প্রান্তের রক্ত-মাংসের মানুষই কমবেশি সংস্কারাচ্ছন্ন। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি এ ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি। (বরুণ, ২০০৩ : পেছনের কভার)

সংস্কারের সাথে ধর্মের একটা গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। লোকসংস্কারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে পৌরাণিক কাহিনির :

> আমাদের দেশের বহু সংস্কার এবং বিশ্বাস ধর্মীয় নির্দেশ অথবা আচার থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কেবল আমাদের দেশে অথবা সমাজেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংস্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই সেই দেশের আচরণীয় ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে স্বীকার করতে হয়। ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনীও অসংখ্য সংস্কার সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে। (বরুণ, ২০০৩ : ২৬)

বাঙালি হিন্দু সমাজে বেশ কিছু লোকসংস্কার লক্ষ করা যায়। যেমন, উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শোয়া নিষিদ্ধ, ঘরের বাইরে গিয়ে মেয়েদের ভিক্ষা দিতে নেই, ভাদ্রমাসের প্রথম দিন যাত্রা নাস্তি, ভাঙা আয়নাতে মুখ দেখতে নেই, ভাজা পিঠের প্রথমটি মেয়েদের খেতে নেই, রাতে মেয়েদের খোলা চুলে বাইরে যেতে নেই, যাত্রার সময় হাঁচি কিংবা টিকটিকির ডাক অশুভ, রাতে কাকের ডাক অমঙ্গলজনক ইত্যাদি হাজারো রকমের লোকসংস্কার রয়েছে আমাদের সমাজে। এসব লোকসংস্কার লোকজীবনেরই বিষয়। নজরুল তাঁর গানে যত্ন সহকারে এসব অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। 'মানুষ গেলে ফিরে না কি দিলে মাথার কিরে', 'ভোরে

উইঠ্যা দেখে যদি কেউ আঁটকুড়ার মুখ — সেদিন অন্ন জোটে না তার, তার মুখে দেয় থুক', 'হাঁচি টিকটিক সিন্নি মানিয়া' ইত্যাদি লোকসংস্কারের প্রসঙ্গ নজরুলের গানে ব্যবহৃত হয়েছে। গানে এসব লোকজ উপাদানের ব্যবহারে তা হয়েছে মাটি ও মানুষের গান। নিচে লোকসংস্কারের প্রসঙ্গ রয়েছে এরকম কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হল :

৪.১
আমার 'সাম্পান' যাত্রী না লয়
ঐ নদীর জলও শুকায় রে ভাই, সে জল আসে ফিরে,
আর মানুষ গেলে ফিরে না কি দিলে মাথার কিরে।
(চোখের চাতক : ১৮, মহুয়ার গান : ১৩)

৪.২
এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই,
মোরা এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান ॥
(সুর-সাকী : ৮১)

৪.৩
এত থাকিতেও সুখ নাইরে রাজার একি হৈল!
সাত-সলিতা ঘিয়ের বাতি নাই যেন রে তৈল!
রাজ্যসুদ্ধা কাঁদে যত ছাইল্যা মাইয়া বুড়া।
ভোরে উইঠ্যা দেখে যদি কেউ
আঁটকুড়ার মুখ —
সেদিন অন্ন জোটে না তার, তার মুখে দেয় থুক।
(তৃতীয় অঙ্ক, *মধুমালা*)

৪.৪
নখ-দন্ত-বিহীন চাকুরি-অধীন আমরা বাঙালি বাবু।
হাঁচি টিকটিক সিন্নি মানিয়া
পরান-পাখিরে রেখেছি ধরিয়া।
(গীতি-শতদল : ৯৮)

৫. লোকাচার

লোকাচার লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান। সব সমাজেরই নিজস্ব কিছু আচার-প্রথা-রীতি থাকে, যা পালনের উদ্দেশ্য নিজের বা পরিবারের কল্যাণ কামনা। এগুলোকে লোকাচার বলে। কিছু কিছু ব্রত ও পূজা লোকাচারের অংশ হিসেবে সমাজে প্রচলিত। বাংলার মানুষেরা সারা বছরই কোনো না কোনো ব্রত বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সে জন্য নির্দিষ্ট কিছু আচারও পালন করা হয়ে থাকে। নামকরণ, ষষ্ঠী পূজা, পানচিনি, গায়ে হলুদ, পানিভরণ, গাম্বী, হ্যাঁচড়া পূজা, পুতলা বিয়া, ব্যাঙ বিয়া, বাস্তুপূজা, গোরক্ষ

পূজা, জামাই ষষ্ঠী, ভুলাপোড়ানি ইত্যাদি লোকাচার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। নতুন জামাই বাড়িতে এলে ধান-দুর্বা-তিল দিয়ে তাকে বরণ করে নেয়া হয়, প্রথম সন্তান প্রসবের সময় মেয়েরা বাবার বাড়ি আসে এবং সেখানেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, বছরে অন্তত একবার জামাইকে আদর করে খাওয়ানো হয় (জামাইষষ্ঠী), কুমারী মেয়েরা ভালো বর পাবার প্রত্যাশায় শিব পূজা করে — ইত্যাদি লোকাচার আমাদের সমাজে এখনও আছে। এসব লোকানুষ্ঠানে কোনো পুরোহিতের দরকার হয় না, নিজেরাই মন্ত্র পাঠ করে, কিংবা ছড়া পড়ে বা গান করে। বিভিন্ন ব্রত, প্রথা এগুলোই লোকাচারের প্রধান বিষয়। মহিলারাই এসব আচার পালনে মুখ্য ভূমিকা রাখে :

> কুমারী এবং বিবাহিতা মেয়েদের নিজেদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেকেরই নিজেদের নিজস্ব ব্রত বা পুজো আছে। সূর্য, পৃথিবী, গাছপালা এবং গ্রহ নক্ষত্র, ব্রত-পুজোয় সাধারণত এই সকল লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাদের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য কোনো পুতুল প্রতিমা বা প্রতীক নেই। অনেক সময় তাদের মন্ত্রস্বরূপ অপ্রচলিত বাংলায় ছড়া আবৃত্তি করা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক দেবতারই একটি মাহাত্ম্যসূচক কথা বা কাহিনী বর্ণিত হয়। বিশেষ অনুষ্ঠানে বিস্তৃত আলপনা আঁকবার ব্যবস্থাও আছে। এইসব ব্রত নামে পরিচিত আনুষ্ঠানিক পুজোতে যে সকল আচার পালন করা হয়, তাদের উদ্দেশ্য সাধারণত ঐন্দ্রজালিক, সেইজন্য তারা অত্যন্ত আদিমভাবাপন্ন। (আশুতোষ, ২০০৫ : ৩০)

ধর্মীয় বিধি-বিধানের সাথে লোকাচারের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। অনেক রীতি-প্রথা ধর্মীয়ভাবে পালন করা হয়ে থাকে। কিছু প্রথা আছে যা ঐ সমাজের একান্ত নিজস্ব বিষয়। 'প্রত্যক্ষ ধর্মীয় আচরণের বাইরেও বাঙালীর একটি বড় আকারের লোকাচার ও সংস্কারের জগৎ আছে। এগুলি মূলতঃ টোটেমবাদ, ধর্মবিশ্বাস, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি বিশ্বাস ও চর্চার অবশেষ। (শাহেদ, ১৯৮৮ : ২৯৭)

আমাদের কৃষিপ্রধান এই দেশে অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টির কারণে ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে। একারণে বৃষ্টি কিংবা খরার জন্য নানারকম আচার পালন করা হয়ে থাকে বাঙালি সমাজে :

> কৃষি-নির্ভর সমাজে প্রকৃতি-নির্ভর মানুষের মধ্যে বৃষ্টি ও রোদ সংক্রান্ত নানারকমের আচার ও সংস্কার থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। খরার দিনে শস্যের জন্য প্রয়োজন হয় বৃষ্টির। তখন ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ছড়া বলে :
>
> খাজুর পাতা হল্‌দি,
> মেঘ নাম জল্‌দি।
> এক বিড়া পান।
> ঝুপ্ ঝপাইয়া নাম।
>
> বৃষ্টি কামনা করে নানারকমের আচারও পালিত হয়। ... বৃষ্টি কামনার আর একটি আচার ব্যাঙ-বিয়ে। গ্রীষ্মকালে অনাবৃষ্টির সময় গৃহস্থ মেয়েরা দু'টো ব্যাঙ পানিভর্তি গর্তে রেখে তাদের বিয়ে দেয় এবং সমস্বরে ছড়া বলে। ... আবার অতিরিক্ত বারিবর্ষণ ফসলের জন্য ক্ষতিকর। তাই কৃষক-সমাজে বৃষ্টি নিবারক আচারেরও অভাব নেই। (শাহেদ, ১৯৮৮ : ২৯৯)

বাঙালির লোকাচার নানামাত্রিকভাবে সমৃদ্ধ। কখনও উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে, কখনও রীতি বা প্রথার কারণে বিভিন্ন লোকাচারের উদ্ভব, কখনও পূজা বা মঙ্গল কামনা থেকে নানা লোকাচারের সৃষ্টি, কখনও অতিথি আগমন বা কোনো কিছু প্রত্যাশার জন্য নানা আচার পালন করা হয়ে থাকে। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে এ তিনটি পরিস্থিতিতেও সামাজিকভাবে নানা লোকাচার পালন করা হয়ে থাকে। এসবই বাঙালির লোকসংস্কৃতির উপাদান। নজরুলের কবিতায় যেমন এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়, তাঁর গানেও তেমন এসবের ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে। নিচে লোকাচারের প্রসঙ্গ রয়েছে এরকম কিছু পদ উল্লেখ করা হলো। নিচে লিপিবদ্ধ ৫.১, ৫.৫, ৫.৯ ও ৫.১১ নম্বর গানে আরতি এবং ধূপ জ্বালানোর প্রসঙ্গ রয়েছে। সন্ধ্যায় মন্দিরে কিংবা ঘরের উঠোনে ধূপ জ্বেলে আরতি করা হয় পরিবারের মঙ্গল কামনায়। যে মালা টিপে কৃষ্ণের নাম স্মরণ করা হয় তাকে জপমালা বলে। জপমালার প্রসঙ্গ রয়েছে ৫.২ এবং ৫.১২ সংখ্যক গানে। বলিদানের প্রসঙ্গ এসেছে ৫.৩, ৫.৪ ও ৫.৯ নম্বর গানে। মনের পশু বলিদানের প্রতীকীরূপে বলিদান প্রথার সৃষ্টি। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এ প্রথার বিলোপ না ঘটলেও অনেক লোপ পেয়েছে। এটাও লোকাচার। ৫.৬ নম্বর গানে রয়েছে ফুলশয্যা ও বাটাভরা খিলিপানের প্রসঙ্গ। বাঙালি সমাজে বিয়ের পর ফুলশয্যা আবশ্যকীয় বিষয়। এতে নানা রকম ক্রিয়াদি পালন করতে হয়। গ্রাম-সমাজে অতিথির আগমনে বাটাভরে পান সেজে পরিবেশন করার রীতি রয়েছে। দেউলে মাটির প্রদীপ জ্বালার প্রসঙ্গ রয়েছে ৫.৭ নম্বর গানে। ৫.৮ নম্বর গানে আছে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করার রীতির প্রসঙ্গ। ৫.১০ নম্বর গানে আছে প্রদীপ জ্বালানো, শাঁখ বাজানো এবং উলুধ্বনি দেয়ার প্রসঙ্গ। গ্রামদেশে অচেনা লোক দেখলে বা বয়োজ্যেষ্ঠ কাউকে দেখলে মহিলাদের ঘোমটা টেনে দেয়ার রীতি আছে। এসবই বাঙালির লোকাচার। নজরুলের গানে এসব প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হওয়ায় গানগুলো লোকমানুষের আপনার সম্পদ, প্রাণের সম্পদ হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে জীবনের অকৃত্রিম বাণীমূর্তি —

৫.১
দেখা দাও, দাও দেখা, ওগো দেবতা।
মন্দিরে পূজারিণী আশাহত।।
ধূপ পুড়িয়া গেছে, শুকায়েছে মালা,
বন্ধ হল বা দ্বার, একা কুলবালা।
প্রভাতে জাগিবে সবে, রটিবে বারতা ॥
জাগো জাগো দেবতা শূন্য দেউলে,
আরতি উঠিছে মোর বেদনার ফুলে
বাণীহীন মন্দির, কহ কহ কথা ॥
(চোখের চাতক : ৫৩)

৫.২
ও ভাই আমার এ নাও যাত্রী না লয়
আমি তারির আশায় তরী লয়ে ঘাটে ব'সে থাকি,
আমার তারির নাম ভাই **জপমালা** তারেই কেঁদে ডাকি।
(চোখের চাতক : ১৮, মহুয়ার গান : ১৩)

৫.৩
কারা-পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ!
হত্যা-যূপে আজি শিশুর বলিদান,
অমৃত-পুত্রেরা মৃত্যু-ম্রিয়মাণ!
(চন্দ্রবিন্দু : ১৬)

৫.৪
কত আর এ মন্দির দ্বার,
ও বেদীর তলে কত প্রাণ
হে পাষাণ, নিলে বলিদান!
তবু হায় দিলে না দেখা,
দেবতা, রহিলে ভুলি' ॥
(সুর-সাকী : ৭)

৫.৫
ব্যথিত বুকে মা গো তোমার মন্দির গড়ি'
করি পূজা আরতি কত যুগ যুগ ধরি'
ধূপ পুড়েছে মা গো, চন্দন শুকায়ে যায়,
আয় মা আয় পুন রানীর মুকুট প'রে ॥
(সুর-সাকী : ৮৪)

৫.৬
ভালোবেসে অবশেষে কেঁদে দিন গেল।
ফুল-শয্যা বাসি হ'ল, বঁধু না এল ॥
পানের খিলি শুকাইল বাটাতে ভরা,
এ পান আমি কারে দিব সে বঁধু ছাড়া,
নীলাম্বরী শাড়ি ছি ছি পরলেম মিছে লো ॥
(গীতি-শতদল : ৫৬)

৫.৭
কোটি রবি শশী আরতি করে যার
মৃৎ-প্রদীপ জ্বালি আমি দেউলে তার,
বন-ডালায় পূজা-কুসুম-সম্ভার
যোগী মুনি করে যুগযুগ ধ্যান।
কোথায় শ্রীমুখ তব কোথায় শ্রীচরণ,
চন্দন দিব কোন্‌খান ॥
(গীতি-শতদল : ৬১)

৫.৮
যবে সন্ধ্যা-বেলায় প্রিয় তুলসী-তলায়
তুমি করিবে প্রণাম।
তব দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক
প্রিয় নিও মোরও নাম ॥
(গানের মালা : ২০)

৫.৯
ভুল করেছি ওমা শ্যামা বনের পশু বলি দিয়ে।
(তাই) পূজিতে তোর রাঙা চরণ এলাম মনের পশু নিয়ে ॥

তুই যে **বলিদান** চেয়েছিস,
কাম-ছাগ ক্রোধরূপী মহিষ;
তোর পায়ে দিলাম লোভের জবা মোহ-রিপুর **ধূপ জ্বালিয়ে** ॥
(রাঙা-জবা : ৩)

৫.১০
ওরে আলয়ে আজ মহালয়া, মা এসেছে ঘর।
তোরা উলু দে রে শঙ্খ বাজা, প্রদীপ তুলে ধর্ ॥
এল মা, আমার মা।।
(রাঙা-জবা : ১০)

৫.১১
শ্যামা নামের লাগল আগুন আমার দেহ-**ধূপকাঠিতে**
যত জ্বালি সুবাস তত ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে ॥
ভক্তি আমার **ধূপের মতো**
ঊর্ধ্বে ওঠে অবিরত
শিবলোকের দেব-দেউলে মার শ্রীচরণ পরশিতে ॥
(রাঙা-জবা : ৭৩)

৫.১২
শ্যামা তোর নাম যার **জপমালা**
তার কি মা ভয় ভাবনা আছে।
দুঃখ অভাব রোগ শোক জরা
লুটায় তাহার পায়ের কাছে ॥
(রাঙা-জবা : ৩৬)

৬. লোকউপকরণ

বেঁচে থাকার জন্যে, জীবন-যাপনের জন্যে মানুষের যেমন বাসগৃহের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নানা উপকরণাদি। গ্রামাঞ্চলের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাধারণত নিজেরাই তৈরি করে নেয়। কখনও এককভাবে, কখনও সম্মিলিতভাবে। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা উপাদান থেকে বা উপাদান দিয়ে তৈরি করে ব্যবহার্য উপকরণাদি। এগুলোতে কখনও শিল্পের ছোঁয়া থাকে, কখনও থাকে না। প্রয়োজন মেটানোই প্রাথমিক বিষয়। তাই বাসগৃহ তৈরি হয়ে থাকে খড় কিংবা গোলপাতা বা তালপাতায়। আসবাবপত্র তৈরি হয় বাঁশ, বেত বা কাঠের দ্বারা। হাঁড়ি, পাতিল, পাত্র সাধারণত মাটি-নির্মিত। নিত্য ব্যবহার্য এই উপকরণই লোকউপকরণ। লাঙল, জোয়াল, মই, বেড়া, পলো, খালুই, চাঁই, কাঁথা, চাটাই, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, বাঁশ-বেতের তৈরি জিনিস, হুক্কা-কল্কে, বাসন-কোশন-হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি লোকউপকরণ। সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরে যেমন থাকে ঢেঁকি, তেমন থাকে ধানের গোলা। খাট, পালঙ, চৌকি, তক্তপোষ, সতরঞ্জি ইত্যাদি লোকউপকরণের পরিচয়

পাওয়া যায়। পরিচয় পাওয়া যায় লেপ, কাঁথা, পানের বাটা, দুধ খাবার বাটি বা ঝিনুক, শেজ, চেরাগ, লণ্ঠন, পিলসুজ, চালন, পিড়ি, কুলা, ঝাটা ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের। এসবই লোকউপকরণ।

সাহিত্যে লোকউপকরণের ব্যবহার লোকজীবনকেই প্রতিনিধিত্ব করে। আর লোকজীবনের মধ্য দিয়েই পরিচয় ঘটে কোনো লোকসংস্কৃতির। বাঙালির রয়েছে এক সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার। বিশ্বের কাছে তাকে স্বমহিমায় তুলে ধরার উপায় শিল্পে-সাহিত্যে-সংগীতে এর বহুল প্রয়োগ। নজরুলের মধ্যে সে-প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাঁর গানে লোকউপকরণ ব্যবহারের আন্তরিক প্রয়াস রয়েছে। নিচের গানগুলোতে তার প্রমাণ মেলে। এখানে ঘট, গাগরি, কলসি, নৈচে, কল্কে, হুঁকো, তামাকু, ছিপ, বড়শি, কাস্তে, মই, আখা, পিলসুজ, লাঙল, বাঁশের কুলো, বেতের ঝাঁপি, পিয়াল পাতার টুকি ইত্যাদি লোকউপকরণের উল্লেখ রয়েছে। এসব লোকউপকরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লোকজীবনের চিত্রটিও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর গানে এসব প্রসঙ্গ থাকায় গান শ্রোতার মনে গ্রামবাংলার ছবি এঁকে চলে একের পর এক। কখনও কখনও চমৎকার চিত্রকল্পের সৃষ্টি করে গানকে করে তোলে ব্যঞ্জনাময় —

৬.১
বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
মাঝি বাঁধে তরী সিনান ঘাটে,
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে,
কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর আঁখি-জলে **ঘট গাগরী** ॥
(বুলবুল ১ম খণ্ড : ৩)

৬.২
কহ প্রিয়ে, কেমনে এ রাতি কাটাই।
বসে আছি **নৈ'চে** ধ'রে
শূন্য **কল'কে** শূন্যে তু'লে,
ধোঁওয়া বিনে চোঁওয়া ঢেকুর
ঠেলে ওঠে কণ্ঠ-মূলে।
প্রাণের দায়ে খেতে হবে
চেঁছে **হুঁকোর** কাই।
তামাকু যে নাই ॥
(সুর-সাকী : ৯২)

৬.৩
পদ্মদিঘির ধারে ঐ
মাছ ধরে সে, **বড়শী** আমার
বুকে এসে বেঁধে,
ওলো সই বুকে এসে বেঁধে,
আর চোখের জলে **কলসি** আমার সই
আমি ভরাই কেঁদে কেঁদে

সই দেখি যত তারে ॥
ছিপ নিয়ে যায় মাছ জলে তার
তাকায় না তার পানে,
(বন-গীতি : ২০)

৬.৪
ও দুঃখের বন্ধু রে, ছেড়ে কোথায় গেলি।
আমি লবণ দিতে পান্তা ভাতে হলুদ দিয়ে ফেলি ॥
তোর **লাঙল** তোর **কাস্তে** নিয়ে
আমি খুঁজে বেড়াই মাঠে গিয়ে,
আমার চোখের জলে মাঠ ভেসে যায়
তুই তবু কই এলি ॥
(বন-গীতি : ৩৬)

৬.৫
আমার পাকা ধানের ক্ষেতে আমি
আপন হাতে দিলাম **মই** ॥
তোর কাঁদনের গাঙের তীরে
আমি নৌকা বেয়ে আস্‌ব ফিরে,
তুই ভেজে রাখিস্ দুখের তাতে
মন-আখাতে প্রেমের **খই** ॥
(বন-গীতি : ৩৭)

৬.৬
নাহি কেহ আমার ব্যথার সাথী
জ্বলি **পিল্‌সুজে** একা মোমের **বাতি** ॥
(গুল্-বাগিচা : ২৩)

৬.৭
আবার জাগ্ রে হলধর!
লাঙল কষে ধর্!
ধরার মতো ধরলে **লাঙল**, হবে তোদের সোনার ঘর ॥
(কবিতা ও গান : ২৩৬)

৬.৮
নাকে নথ দুলাইয়া চলে, কাঁখে **কলস** পোলা কোলে
যেন **হুঁক্কা** বাঁদা থোলে, এরা মোর হউরের মাইয়া ॥
(কবিতা ও গান : ৮৫৯)

৬.৯
বাঁশের কুলো, বেতের ঝাঁপি, পিয়াল পাতার টুকি।
নাও ওগো বৌ, হবে খোকা-খুকি ॥
নাচ, নাচ, নাচ — বেদের নাচ? সাপের নাচ?
সোলেমানী **পাথর** নেবে? রঙিন **কাচ**?
(সংগীতাংশ, *গীতিবিচিত্রা*)

৭. লোককারিগরি

লোকউপকরণ তৈরির কৌশলই লোককারিগরি। বাঁশ, বেত, ঘাস, মাটি বা কাঠ দ্বারা নানা কিছু তৈরি করার স্থানীয় পদ্ধতিই লোককারিগরি। নানা রকম লোকবাদ্যযন্ত্র, খেলনা, পাত্র তৈরিও লোককারিগরির অন্তর্ভুক্ত। লাঙল, জোয়াল, মই, কাস্তে, কোদাল, পাটি, বেড়া, জাল, হুঁকো, শিকা, পালকি, নৌকো বা ভেলা নির্মাণের পদ্ধতি ইত্যাদি সবই লোক কারিগরির বিষয়। এসব কাজ শেখার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। দেখতে দেখতে করতে করতে বংশ পরম্পরায় গ্রামের মানুষ এসব কাজ আয়ত্ত করে ফেলে। এলাকাভেদে এর গঠন ও গঠনগত কৌশলেরও তারতম্য ঘটে।

বাঁশি লোকবাদ্যযন্ত্র। এ তৈরির কৌশল লোককারিগরি। নিচের ৭.১ ও ৭.১২ নম্বর গানে বাঁশির উল্লেখ রয়েছে। বাঙালির লোকপাত্রের প্রধান একটি হচ্ছে ঘট। ঘট তৈরি করা কুমারের কাজ। তাও লোককারিগরির বিষয়। ৭.১, ৭.৪ ও ৭.৬ নম্বর গানে ঘটের প্রসঙ্গ এসেছে। চুড়ি (৭.১০ ও ৭.১১ নম্বর গান), কলস (৭.৫ নম্বর গান), ধুচনি-ধামা (৭.২ নম্বর গান), হাঁড়ি (৭.৩ নম্বর গান), ঘুমুর (৭.৭ নম্বর গান), পানসি (৭.৭ নম্বর গান), মেখলা (৭.৯ নম্বর গান), চাবি রিং (৭.১০ নম্বর গান), নাও (৭.১১ ও ৭.১২ নম্বর গান), খাড়ু (৭.১১ নম্বর গান), দাঁড় (৭.১২ নম্বর গান) ইত্যাদি লোকউপকরণ এবং এসব তৈরির প্রক্রিয়াই লোককারিগরি। লোককারিগরির সাথে লোকজীবনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। লোককারিগরির মধ্যে ঐতিহ্যের স্পর্শ থাকে। নজরুলের গানে এসব লোককারিগরির পরিচয় পাওয়া যায় —

৭.১
বৃন্দাবনে এ কি বাঁশরী বাজে।
গোপিনী উন্মনা, মন নাহি কাজে ॥
কুলবধূ-**ঘটে ঘটে** সে বাঁশি স্বনে
উছলি' উছলি' ওঠে নীর ক্ষণে ক্ষণে।
নয়ন-সলিল ঝরে গাগরী-মাঝে ॥
(চোখের চাতক : ৫১)

৭.২
ধুচ্‌নি মাথায় হাতে **ধামা**
দেখে মোদের রসিক-রাজ —
ডোমের জাতি ভেবে — দিলেন
ডোম্‌নি ক'রে মাতায় আজ ॥
(কমিক গান : ডোমিনিয়ন স্টেটাস্, *চন্দ্রবিন্দু*)

৭.৩
মাজায় বেঁধে পৈতে বামুন
রান্না করে কার না বাড়ি,
গা ছুঁলে' তার লোম ফেলে না,
ঘর ছুঁলে তার ফেলে হাঁড়ি!
(কমিক গান : দে গরুর গা ধুইয়ে দে, *চন্দ্রবিন্দু*)

৭.৪
পায়ে যে বিঁধেছে কাঁটা সজনী ধীরে ধীরে চল।
চলিতে ছলকি' যায় ঘটে জল ছল ছল ॥
ভরা যৌবন-তরী,
তাহে ভরা **গাগরি**,
(সুর-সাকী : ২৩)

৭.৫
আনমনে জল নিতে ভাসিল **গাগরি**।
সাঁতার জানি না, আনি **কলস** কেমন করি' ॥
জানি না, বলিব কি, শুধাবে যবে ননদী
কাহার কথা ভাবে পোড়া মন নিরবধি,
গাগরি না ভাসিয়া ভাসিতাম আমি যদি —
কি বলিব কেন মোর ভিজিল গো **ঘাগরী** ॥
(সুর-সাকী : ৩৪)

৭.৬
সাম্‌লে চ'লো পিছল পথ গোরী।
ভরা যৌবন তায় ভরা **গাগরি** ॥
. . . . . .
তব **ঘটের** সলিল চাহিয়া সই
কত তৃষ্ণা-আতুর পথিক দাঁড়ায়ে ঐ,
মরু-ভূমে তুমি মেঘ-পরী ॥
(সুর-সাকী : ৬৪)

৭.৭
নাচন লাগে ঐ তরুলতায় পাতায় ফুলে।
মৃণাল-তনু কমল নাচে এলো খোঁপায় নীল জলে,
ঝুমুর ঝুমুর **ঘুমুর** বাজায় নির্ঝর পাষাণ-তলে।
বাদ্‌লা হাওয়ায় তাল্‌বনা ঐ বাজায় চটুল্ দাদ্‌রা তাল,
নদীর ঢেউ-এ মৃদং বাজে, **পানসী** নাচে টালমাটাল।
নেচে নেচে গ্রহতারা দিশাহারা নটরাজের নাট-দেউলে ॥
(সুর-সাকী : ৭৮)

৭.৮
যায় ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ ঢেউ তুলে দেহের কূলে
চলে নাগরী দোলে **ঘাগরী,**
কাঁখে বর্ষা-জলের **গাগরি,**
বাজে **নূপুর** সুর-লহরী —
রিমিঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
চল-চপলা ॥
(গানের মালা : ৯৩)

৭.৯
আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুল্‌বি তোরা আয়।
দখিনার দোল্ লেগেছে দোলন্-চাঁপায় ॥
. . . . . .
দুলে আজ শিথিল বেণী, দুলে বধূর **মেখলা,**
দুলে গো মালার পলা জড়াতে বঁধুর গলা।
(বুলবুল ১ম খণ্ড : ২৬)

৭.১০
বাজায়ে কাচের **চুড়ি**
কাঁকনে চুড়িতে বাজে সুর মধুর আওয়াজ,
. . . . . .
আঁচলে বাঁধা তার কোন্ বীণ,
রিনিঝিন্ বাজে **চাবির রিং,**
. . . . . .
চরণ-কমল ধরি' নূপুর মিনতি করে,
(সুর-সাকী : ৫৩)

৭.১১
সোনার বরণ কন্যা গো, এস আমার সোনার নায়ে
চল আমার বাড়ি।
ওরে অচিন দেশের বন্ধু রে, তুমি ভিন্ গেরামের নাইয়া,
আমি ভিন্ গেরামের নারী ॥

গয়না দিব **পৈঁচি খাড়ু,** শাড়ি ময়নামতির;
গয়না দিয়ে মন পাওয়া যায় না কুলবতীর।
শাপলা ফুলের মালা দিব, রাঙা **রেশমি চুড়ি**।
(কবিতা ও গান : ৮৫০)

৭.১২
বান এসেছে, বাঁধ ভেঙেছে, নায়ে দোলা লাগে;
আড় বাঁশিতে তান ছেড়ে তুই **দাঁড়** বেয়ে চল্ আগে;
দেখ্ জোয়ার জলে ডুবে গেছে চরের চোরাবালি ॥
(বুলবুল ২য় খণ্ড : ৫৫)

৮. লোকশিল্পকলা

যা সুন্দরকে আরও সুন্দর করে তা-ই শিল্প। মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, জীবনযাপনের কারণে আসবাবপত্রসহ নানা উপকরণাদি তৈরি করে। এগুলো শুধু প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই নয়, গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকেও লক্ষ রেখে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। মনের মাধুরী মিশিয়ে তাতে নানা কারুকাজ করা হয়, নকশা আঁকা হয়; প্রয়োজন ছাপিয়ে তাতে

নন্দনতত্ত্বের ছোঁয়া পড়ে। এ শিল্পকর্মে লোকজীবনের ছায়া থাকে। যেমন নকশি কাঁথায় হাঁড়ি, পাতিল, কুলা, লোকমানুষের চিত্র ফুটে ওঠে। আলপনা, শীতলপাটি, পটচিত্র, পুতুল, মুখোশ ইত্যাদিতে যে কারুকাজ তাতে লোকমানুষ ও লোকজীবনের নানা অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। হয়ত তা কিছুটা স্থূল, অপটু হাতের তৈরি; তবু তার মধ্যে প্রাণের ছোঁয়া থাকে। মাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাধারণ মানুষ সৃষ্ট এ শিল্পই লোকশিল্প। লোকশিল্প লোকসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান :

> মানুষ ব্যবহারিক জীবনযাপনের পথে যা কিছু সৃষ্টি করেছে, সে সব বস্তু স্বরূপে সংস্কৃতির স্বরূপ। আবার মনোজগতে আর এক সৃষ্টিলীলা নিয়ত চলেছে ও চলছে, তার চিন্তাধারা, জ্ঞানবুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, কল্পনা-অনুভূতির প্রকাশ নানাভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে শিল্পলোকে, সৃষ্টিকলায়। (ওয়াকিল, ১৯৭৪ : ২)

নিচের পদগুলোতে মোতির মালা, নোলক (৮.১ ও ৮.৬ নম্বর গান), নূপুর (৮.২ ও ৮.৪ নম্বর গান), মেখলা, পলা (৮.৩ ও ৮.৮ নম্বর গান), কাঁকন (৮.৪ নম্বর গান), চুড়ি (৮.৫, ৮.৮ ও ৮.৯ নম্বর গান), ঘাঘরি (৮.৫ নম্বর গান), দীপাধার (৮.৬ নম্বর গান), নাকছাবি (৮.৫ নম্বর গান), পট, প্রতিমা (৮.৭ নম্বর গান), নথ (৮.১০ নম্বর গান), কবচ (৮.৯ নম্বর গান) ইত্যাদি লোকশিল্পকলার উদাহরণ। নূপুর, কাঁকন এবং চুড়ির উল্লেখ বেশি সংখ্যক পদে। গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা যে এ অলঙ্কারগুলো বেশি ব্যবহার করত বা এখনও করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ থেকে। এখানে উল্লেখ করা প্রত্যেকটি অলঙ্কারই লোকমানুষের ব্যবহার্য। এর মধ্য দিয়ে বাংলার লোকজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। জানা যায় শিল্পসচেতনতার ও আর্থনীতিক অবস্থার পরিচয়। লোকগানে নজরুল এসব প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন সচেতনভাবে। এসব লোকজ বিষয় বা অনুষঙ্গ ব্যবহারে গান হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত এবং লোকমানুষের নিজস্ব সম্পদ —

৮.১
এত জল ও-কাজল-চোখে
পাষাণী, আন্‌লে বল কে।
টলমল জল-**মোতির মালা**
দুলিছে ঝালর-পলকে ॥
. . . . . .
সরসীর ঢেউ পলায় ছুটি
না ছুঁতেই নলিন-নোলকে ॥
(বুলবুল ১ম খণ্ড : ৯)

৮.২
নিশিদিন চাহি' তোমারে
ওপারে বাজিছে বাঁশি,
এপারে বাজে বধূর
মল-নূপুর মধু-ভাষিণী ॥
(বুলবুল ১ম খণ্ড : ১৭)

৮.৩
দুলে আজ শিথিল বেণী, দুলে বধূর মেখলা,
দুলে গো মালার পলা জড়াতে বঁধুর গলা।
(বুলবুল ১ম খণ্ড : ২৬)

৮.৪
আঁধার রাতে কে গো একেলা
সোনার **কাঁকন** ও দু'টি করে
হের গো জড়ায়ে মিনতি করে।
খুলিয়া ধূলায় ফেলো না গো তায়
সাধিছে **নূপুর** চরণ ধ'রে।
(চোখের চাতক : ২১)

৮.৫
দিল **নাকেতে নাক্‌ছাবি** বাব্‌লা ফুলি
কুচের চুড়ি আর ঝুমকো ফুল দুল্ লো।
নিয়ে লাজ দুকূল দিল **ঘাঘরি** সে
আমায় **গাগরী** ভাসাল জলে বাতুল লো ॥
(মহুয়ার গান : ১)

৮.৬
আঁখিজলে গাঁথা আমি **মোতি-মালা,**
দীপাধারে মোর প্রাণ জ্বালি ॥
(নজরুল গীতিকা : ২৫)

৮.৭
কি নাম ধরে ডাকবো তোরে
বনে খুঁজি মনে খুঁজি,
পটে দেখি, ঘটে পূজি;
মন্দিরে যাই কেঁদে লুটাই, মা গো!
পাষাণ **প্রতিমা** মা তোর
একটুও না টলে ॥
(রাঙা-জবা : ৮৪)

৮.৮
হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে এনে দে নৈলে বাঁধব না বাঁধব না চুল।
কুস্‌মি রং শাড়ি চুড়ি বেলোয়ারি
কিনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে
বাব্‌লা ফুল আমের মুকুল।।
. . .
পলার মালা নাই,
কি যে করি ছাই,
গাঁথব মালা রে, এনে দে এনে দে এনে দে রে সিঁয়া-কূল ॥
(কবিতা ও গান : ৩৫)

৮.৯
বেলওয়ারি চুড়ি কে নিবি আয় পুর-নারী।
চুড়িওয়ালী আমি এনেছি **চুড়ি** রকমারি ॥
যৌবন যার হল বাসি
বঁধু যার পরবাসী
এই **চুড়ি কবচ** তারি ॥
কে আছ বিরহিণী
এই **রেশমি চুড়ি** কিনি
ভোলো বিরহ ভোলো ভোলো,
মিলনের রাখি **কাচের এ চুড়ি;**
কালো মেয়ে হবে তার স্বামীর প্যারী ॥
(কবিতা ও গান : ৮১২)

৮.১০
নাকে নথ দুলাইয়া চলে, কাঁখে কলস পোলা কোলে
যেন হুঁক্কা বাঁদা থোলে, এরা মোর হউরের মাইয়া ॥
(কবিতা ও গান : ৮৫৯)

৯. লোকবিজ্ঞান

লোকবিজ্ঞান মূলত লোকসমাজেরই প্রচলিত কারিগরি-কৌশল। লোকমানুষ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। এসব তৈরির কৌশলই লোকবিজ্ঞান :

> বিজ্ঞান লোক-সংস্কারের পরোয়া করে না। বিজ্ঞানের ধর্মীয় বা যাদুবিদ্যাগত কোনো দিক নেই। কিন্তু লোকসমাজ যে সব বৈজ্ঞানিক বিধি-বিধানকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন তা ধর্মীয় ও যাদুবিদ্যাগত প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বের লোকসমাজে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক বিধি-বিধান এর হাত থেকে রেহাই পায় নি। এবং এ কারণেই বিজ্ঞানের সাথে লোকবিজ্ঞানের পার্থক্য ঘটেছে। লোকসমাজে প্রচলিত কারিগরি কৌশলসমূহের সামগ্রিক নামই হলো লোকবিজ্ঞান। অন্যকথায় লোকসমাজ স্ব-পরিবেশ থেকে যে যে পন্থায় কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং যে যে পন্থায় কাঁচামালকে ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্রে — যেমন থালা-বাটি, বাসন-কোসন, পাত্রাদি ও খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ ও যাতায়াতের ব্যবস্থাদিকে রূপান্তরিত করতে পারে, তাকে সামগ্রিকভাবে লোকবিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়। (বিমল, ২০০১ : ১৭১)

নিচের পদগুলোতে গৈরিক রঙের বাস (৯.১ নম্বর গান), তাম্বুল-রাঙা (৯.২ নম্বর গান), ঘাঘরা, পলার মালা, মহুয়ার মউ (৯.৩ নম্বর গান), আবীর, কুঙ্কুম, পিচকারি (৯.৪ নম্বর গান), শাড়ি, আলতা (৯.৫ নম্বর গান) ইত্যাদি লোকবিজ্ঞানের প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। গানে এসব লোকবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ ব্যবহারে নজরুলের ঐতিহ্যপ্রিয়তার পরিচয় মেলে।

৯.১
হব ভিক্ষার ঝুলি, শ্যাম লবে তুলি'
বাহুতে আমারে জড়ায়ে,

সখি আমার বেদনা-গৈরিক-রাঙা
বাস দেব তারে পরায়ে।
নবীন যোগীরে সাজাইব আমি,
(চোখের চাতক : ২৫)

৯.২
শ্যামের সাথে
রঙ্গিলা গালে **তাম্বুল-রাঙা ঠোঁটে**
হিঙ্গুল রঙ্ লহ ভরি'
(সুর-সাকী : ১)

৯.৩
বাঘ-ছাল পরে আয় হৃদয়-বনের শিকারি
ঘাঘরা পরে, পরে **পলার মালা**
আয় বেদের নারী।
মহুয়ার মউ নিয়ে ধুতুরা ফুলের পিয়ালায়
আয় আয় আয় ॥
(বুলবুল ২য় খণ্ড : ৬০)

৯.৪
শ্যামল তনু হল রাঙা **আবীরে** রেঙে,
ইন্দ্রধনু-ছটা যেন কাজল মেঘে,
রাঙিল রঙে নীল **চোলি** ॥

লহু লহু হাসে মুহু মুহু ভাসে
কুঙ্কুম ফাগের রাগে,
দোঁহে দুহু ধরি' মারে পিচকারি
চাঁদ-মুখে কলঙ্ক জাগে
কুঙ্কুম ফাগের রাগে।
অঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গিমা
ইঙ্গিতে উঠিছে উছলি' ॥
(কবিতা ও গান : ১৯৩)

৯.৫
পরনে তার মেঘ-ডম্বুর উদয়-তারার **শাড়ি,**
রূপ নিয়ে তার চাঁদ-সুরুযে করে কাড়াকাড়ি,
আমি তারি লাগি বিবাগী ভাই,
আমার চির-পথিক বেশ ॥
পিছ্‌লে পড়ে চাঁদের কিরণ নিটোল তারি গায়ে,
সন্ধ্যা সকাল আসে তারি **আল্‌তা** হ'তে পায়ে।
(সুর-সাকী : ৫০)

১০. লোকচিকিৎসা

লোকসমাজে প্রচলিত লোকমানুষ সৃষ্ট চিকিৎসাই লোকচিকিৎসা। তুকতাক, ঝাঁড়ফুক, তাবিজ, কবচ, গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, পানিপড়া ইত্যাদি লোকচিকিৎসার মধ্যে পড়ে। মাদুলি বা তাগার ব্যবহারও লোকচিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে টোটকা চিকিৎসাও বলে থাকে। কোনো কোনো লোকচিকিৎসায় ওষুধের ব্যবহার থাকে না, নানারকম লৌকিক আচার বা ক্রিয়া পালন করতে হয়। নিজস্ব বা সামাজিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই এসব চিকিৎসা করা হয়ে থাকে, এর সাথে পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। এর অনেকটাই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে পালন করা হয়ে থাকে। অনেক লোকচিকিৎসা লোকসংস্কারেরই অংশ। ওঝা, কবিরাজ, হাতুড়ে ডাক্তার এমনকি বুড়ো-বুড়িরাও এ ধরনের চিকিৎসা করে থাকে :

> লোকচিকিৎসার আরেকটি পদ্ধতি তুকতাক। মন্ত্রপূত তাবিজাদি ধারণ অথবা খাদ্যদ্রব্য বা গাছ গাছালির ভক্ষণ বা লেপনকে তুকতাকের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যাদুগুণই তুকতাকের চিকিৎসার মূল শক্তি। তুকতাকের চিকিৎসক কোন পেশাদার ওঝা অথবা হাতুড়ে কবিরাজ, পীর-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী হতে পারে। (খালেক, ১৯৮৫ : ৩০৫)

গ্রামের অশিক্ষিত, দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষ অজ্ঞানতা ও অসচেতনতার কারণে নানা গ্রাম্য রোগে আক্রান্ত হয়। এর অনেকটাই ছোঁয়াচে, সংক্রামক এবং অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতার ফসল। অপুষ্টির কারণে সৃষ্ট রোগও রয়েছে অনেক। গলার ঘ্যাগ, পায়ের গোদ, পিঠের কুঁজ, দাঁতের পোকা, কানের পুঁজ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা লোকচিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। নজরুলের নিচের গানটিতে এ ধরনের কতগুলো রোগের লোকচিকিৎসার উল্লেখ আছে। এতে লোকমানুষ ও লোকজীবনের সঙ্গে নজরুলের সম্পৃক্ততার পরিচয় মেলে। নিচের উদ্ধৃতিটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় —

কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো,
শ্বশুর সওদাগর,
ঐ মান্দাসে চড়ে যাবে বেউলা লখিন্দর,
কলার মান্দাস।
. . . . . .
আমরা বেদেনী গো, পাহাড় দেশের বেদেনী।
গলার ঘ্যাগ, পায়ের গোদ, পিঠের কুঁজ,
বের করি দাঁতের পোকা, কানের পুঁজ;
ঔষধ জানিলো, হুঁৎকা স্বামীর
কোঁৎকা খায় যে কামিনী ॥
(সংগীতাংশ, *গীতিবিচিত্রা*)

১১. লোকউৎসব

উৎসব বাঙালির জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। লোকউৎসব বাঙালি সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান। সাধারণত গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ তাদের অবসরের কালে বিভিন্ন

উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এসব উৎসব সমৃদ্ধ বাঙালির নিজস্ব কৃষ্টি ও আচারে। এ উৎসবগুলো প্রকৃতপ্রস্তাবে বাঙালির লোকাচারেরই নিদর্শন। কোনো কোনো উৎসবের সাথে ধর্মবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ বলে এ উৎসবগুলোর অধিকাংশই ফসল তোলাকে কেন্দ্র করে পালন করা হয়ে থাকে :

> বাঙালীর উৎসবের চিত্রকে তার লোকাচার ও সংস্কারের জগৎ থেকে পৃথক করা দুরূহ। কেননা বঙ্গের উৎসবের মধ্যেও রয়েছে আচারের অংশ এবং সংস্কারের রেশ। উৎসব এখানে অনেকাংশে ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার হতে উদ্ভূত। আবার নানাধরনের লোকাচার এই উৎসবের অপরিহার্য অংশ। কৃষিভিত্তিক সমাজে শস্য-উৎসব (Harvest Festival) একটি প্রধান উৎসব হবে, এটাই স্বাভাবিক। বাঙালীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। (শাহেদ, ১৯৮৮ : ৩০৪)

এসব উৎসব উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আত্মীয় পরিজন বেড়াতে এলে নানারকম খাদ্য তৈরি করে পরিবেশন করা এবং খাওয়া হয়ে থাকে। উৎসব ও পার্বণের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। পার্বণের সাথে পিঠে-পায়েস-মিষ্টান্ন ইত্যাদি খাবারের বিশেষ করে নতুন চালের তৈরি খাদ্যদ্রব্যের সম্পর্ক রয়েছে। দোলপূর্ণিমা, মাঘীপূর্ণিমা, কোজাগরীপূর্ণিমা, ঝুলন, দীপাবলি, গাজন, নৌকাবাইচ, আড়ং, রথযাত্রা এসবই বাঙালির লোকউৎসব। প্রাচীনকাল থেকেই এসব উৎসব বাঙালির ঘরে পালিত হয়ে আসছে। তাই ঐতিহ্যের সঙ্গে এসব লোকউৎসবের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নজরুল ঐতিহ্য-সচেতন কবি। তাঁর কবিতা ও গানে এসব লোকউৎসবের পরিচয় মেলে। দোল উৎসব (১১.১ নম্বর গান), হোলি খেলা (১১.২, ১১.৭, ১১.৮, ১১.৯ ও ১১.১১ নম্বর গান), মোহর্‌রম (১১.৩ নম্বর গান), রমজান (১১.৪ নম্বর গান), ঈদুজ্জোহা (১১.৫ নম্বর গান), ঝুলন, রাস (১১.৬ নম্বর গান), কোজাগরী পূর্ণিমা (১১.১০ ও ১১.১২ নম্বর গান), আগমনী (১১.১২ নম্বর গান) ইত্যাদি লোকউৎসবের উল্লেখ রয়েছে নিচের গানগুলোতে। এসব লোকউৎসবের সাথে বাঙালির অর্থনৈতিক সম্পর্কও বিদ্যমান। সচেতনভাবে নজরুল তাঁর গানে এ সব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এখানেই নজরুলের স্বাতন্ত্র্য।

১১.১
আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুল্‌বি তোরা আয়।
দখিনার দোল্ লেগেছে দোলন্-চাঁপায় ॥
(বুলবুল ১ম খণ্ড : ২৬)

১১.২
আয় গোপিনী খেল্‌বি হোলি
ফাগের রাঙা পিচ্‌কারীতে ॥
আজ শ্যামে লো করব ঘায়েল্
আবীর হাসির টিট্‌কারীতে ॥
(সুর-সাকী : ৩৫)

১১.৩
মোহর্‌রমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।
ওয়া হোসেনা ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায় ॥
(জুলফিকার ১ম খণ্ড : ৫)

১১.৪
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এল খুশির ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন্ আস্‌মানী তাকিদ ॥
(জুলফিকার ১ম খণ্ড : ৭)

১১.৫
ঈদজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ
গলায় গলায় মিল্ রে সবে
ভুলে যা ঘরোয়া বিবাদ,
শির্‌নী দে তুই শিরীন্ জবান
তশ্‌তরীতে প্রেম মফিদ ॥
(গুল্-বাগিচা : ৭৭)

১১.৬
এস ঝুলনে হোরীতে রাসে,
কুরুক্ষেত্র-রণে, এস প্রভাসে,
(গীতি-শতদল : ৫৯)

১১.৭
আজি নন্দ-দুলালের সাথে
খেলে ব্রজনারী হোরী।
কুঙ্কুম আবীর হাতে
দেখ খেলে শ্যামল খেলে গোরী।
(গীতি-শতদল : ৬৯)

১১.৮
কুঙ্কুম আবীর ফাগের
লয়ে থালিকা
খেলিছে 'রসিয়া' হোরি
ব্রজ-বালিকা ॥
(গানের মালা : ৮৩)

১১.৯
আবীর-রাঙা আভীরা নারী সনে
কৃষ্ণ কানাই খেলে হোলি।
হোরির মাতনে চুড়ি ও কাঁকনে
উঠিছে কল-কাকলি ॥
(কবিতা ও গান : ১৯৩)

১১.১০
লক্ষ্মী মা গো এসো ঘরে
সোনার ঝাঁপি লয়ে করে।
কমল বনের কমলা গো
বিহর হৃদি-কমল পরে ॥

কোজাগরী পূর্ণিমাতে
দাঁড়াও আকাশ আঙিনাতে,
(কবিতা ও গান : ৫৮৯)

১১.১১
ব্রজগোপী খেলে হোরি
খেলে আনন্দ নবঘনশ্যাম সাথে ॥
পিরিতি-ফাগ-মাখা গোরীর সঙ্গে
হোরি খেলে হরি উন্মাদ রঙ্গে।
বসন্তে এ কোন্ কিশোর দুরন্ত
রাধারে জিনিতে এল পিচকারি হাতে ॥
(কবিতা ও গান : ৬৬০)

১১.১২
মম আগমনে বাজে **আগমনীর সানাই।**
আমি আনি দেশে দশ-ভূজার পূজা,
কোজাগরী নিশি জাগি আমি অনুজা।
(গানের মালা : ৫৫, শরতের গান : ৪৭৭)

১২. লোকপার্বণ

লোকপার্বণও বাঙালির লোকউৎসবেরই অংশ। শ্রমজীবী মানুষ বছরের এক একটা সময়ে অবসর নিয়ে নানা উৎসবের আয়োজন করে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। লোকপার্বণও ফসল ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করেই পালন করা হয়ে থাকে। পৌষসংক্রান্তি, চৈত্রসংক্রান্তি, নবান্ন, হালখাতা ইত্যাদি বাঙালির উল্লেখযোগ্য পার্বণ। এগুলোর সাথে খাদ্য, পোশাক, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির রয়েছে পৃথক পৃথক ধরন। বিভিন্ন পার্বণে পিঠে, মুড়ি, মুড়কি, মিষ্টি এ জাতীয় খাবারেরই প্রচলন বেশি। এসব শুধু একা নয়, আত্মীয় পরিজন সবাই মিলে এই ভোজনপর্ব সমাধা করে থাকে। এর মধ্য দিয়ে বাঙালির আতিথেয়তা ও যৌথ পারিবারিক বন্ধনের চিত্র ফুটে ওঠে। এই উৎসব-পার্বণগুলো সম্পর্কের বন্ধনকে প্রগাঢ় করে। লোকপার্বণ বাঙালির কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে। এসব উৎসব-পার্বণেই বাঙালির স্বকীয়তার প্রকাশ, ঐতিহ্যের পরিচয়। প্রজ্ঞাবান ও ঐতিহ্য-সচেতন সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাক্ষর রাখেন। নজরুল তাঁর সাহিত্যে নানাভাবে লোকসংস্কৃতির ছোঁয়া রেখেছেন। নিচের গানটিতে 'নবান্ন' লোকপার্বণের উল্লেখ করা হয়েছে। 'নবান্ন' উৎসবে নবান্নের সুঘ্রাণে চাষীর মুখে হাসি ফোটে, মনে খুশি জাগে। তার ফলে চাষীর কণ্ঠে গান ঝরে, চাষী টপ্পা গেয়ে ওঠে। এ ফসল তোলার আনন্দ। নিচের গানটিতে চমৎকারভাবে বাঙালির চিরায়ত লোকচরিত্রটি ধরা পড়েছে—

উত্তরীয় লুটায় আমার
ধানের ক্ষেতে হিমেল হাওয়ায়।
আমার চাওয়া জড়িয়ে আছে
নীল আকাশের সুনীল চাওয়ায় ॥

ভাঁটির শীর্ণা নদীর কূলে
আমার রবি-ফসল দুলে,
নবান্নেরই সুঘ্রাণে মোর
চাষীর মুখে টপ্‌পা গাওয়ায় ॥
(গানের মালা : ৫৬)

১৩. লোকপূজা

পূজা মানুষের আদিমতম সংস্কারগুলোর অন্যতম। প্রকৃতির কাছে মানুষ অসহায়। সে নির্ভরতা চায়, ভালোভাবে বাঁচতে চায়। তাই আশ্রয় খোঁজে অলৌকিক কোনো শক্তির, যে তাকে উদ্ধার করতে পারবে বিপদ থেকে। সেই অলৌকিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে তাঁর উপাসনা করে, পূজার আয়োজন করে। সেখান থেকেই দেব-দেবীর কল্পনার জন্ম। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে বিশেষ করে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যেই পূজার প্রচলন রয়েছে। পূজা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের হলেও তার আচার-অনুষ্ঠান আজ আর সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা সমস্ত বাঙালির। তাই তা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। পূজা বিষয়টিই লোকজ। তাই যে কোনো পূজাকেই লোকপূজা বলা যায়। কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা, শীতলাপূজা, রক্ষাপূজা, ওলাবিবিপূজা, বাস্তুপূজা, চড়কপূজা, শনিপূজা ইত্যাদি পূজার প্রচলন রয়েছে বাংলাদেশে। এ সবই লোকপূজা। প্রত্যেক পূজারই রয়েছে স্বতন্ত্র বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠান। পুজা শেষে থাকে চাল, কলা, মিষ্টি বা ফলমূলের তৈরি সুস্বাদু প্রসাদের ব্যবস্থা। পূজা বাঙালি হিন্দুর উৎসব বা পার্বণেরই অংশ। এ উপলক্ষে আত্মীয়-পরিজনের সমাগম ঘটে। নানারকম খাদ্য-খাবারের আয়োজন করা হয়। তন্মধ্যে নাড়ু, চিড়া, দই, খই, মিষ্টি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যায় থাকে অনাবিল আরতির আয়োজন। ধূপ-ধুনোর গন্ধের মধ্যে ঢাকের বাদ্যের সাথে থাকে লোকনৃত্যের ব্যবস্থা। নারী-পুরুষ সকলেই এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। নির্মল আনন্দপ্রাপ্তিই এর উদ্দেশ্য। এসব আবার লোকাচার ও লোকসংস্কারেরও অংশ। বাঙালি লোকসংস্কৃতির প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যেকটির সম্পর্ক এত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ যে একটার থেকে অন্যটাকে পৃথক করে আলোচনা করা কষ্টসাধ্য। একটার আলোচনাকালে অন্যটার প্রসঙ্গ এসেই যায়।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তচিন্তার মানুষ। ধর্মীয় কোনো গোঁড়ামি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাই রোজা বা পূজা তাঁর কাছে সমার্থক। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ভিতকে শক্ত ও প্রগাঢ় করার প্রত্যয় ছিল নজরুলের অন্তরে। তাঁর গানই তা প্রকাশের উত্তম স্থান। নিচের প্রত্যেকটি গানেই পূজার প্রসঙ্গ এসেছে। এসবই লোকপূজার অঙ্গ —

১৩.১
দেখা দাও, দাও দেখা, ওগো দেবতা।
মন্দিরে পূজারিণী আশাহত ॥
ধূপ পুড়িয়া গেছে, শুকায়েছে মালা,
বন্ধ হল বা দ্বার, একা কুলবালা।
প্রভাতে জাগিবে সবে, রটিবে বারতা ॥

জাগো জাগো দেবতা শূন্য দেউলে,
আরতি উঠিছে মোর বেদনার ফুলে
বাণীহীন মন্দির, কহ কহ কথা ॥
(চোখের চাতক : ৫৩)

১৩.২
ব্যথিত বুকে মা গো তোমার মন্দির গড়ি'
করি পূজা আরতি কত যুগ যুগ ধরি'
ধূপ পুড়েছে মা গো, চন্দন শুকায়ে যায়,
আয় মা আয় পুন রানীর মুকুট প'রে ॥
(সুর-সাকী : ৮৪)

১৩.৩
ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী
শূন্য দেউল বন্ধ আরতি,
কাঁদিছে পূজারী, নাহি মা মুরতি,
পূজার কুসুম চন্দন যায়
আঁখি-জলে — ভাসিয়া মা গো ॥
(বন-গীতি : ১৮)

১৩.৪
মনে যে মোর মনের ঠাকুর
তারেই আমি পূজা করি,
আমার দেহের পঞ্চভূতের
পঞ্চ প্রদীপ তুলে ধরি ॥
(গুল্-বাগিচা : ৬২)

১৩.৫
তোমারে কি দিয়া পূজি ভগবান।
মন্দিরে তুমি, মূরতিতে তুমি,
পূজায় ফুলে তুমি, স্তব-গীতে তুমি,
ভগবান দিয়ে ভগবান পূজা
করিতে — তুমি যদি ভাব অপমান ॥
(গীতি-শতদল : ৬১)

১৩.৬
মোরা সাজিয়ে কালি গৌরী মাকে
পূজা করি তমসাকে
মায়ের শুভ্রা রূপ দেখে সে
শুভ্র-শুচি যার ভকতি ॥
(রাঙা-জবা : ১১)

১৩.৭
আয় অশুচি আয় রে পতিত,
এবার মায়ের পূজা হবে।

যথা সকল জাতির সকল মানুষ
নির্ভয়ে মার চরণ ছোঁবে।
(সেথা) এবার মায়ের পূজা হবে ॥
(রাঙা-জবা : ৪৭)

১৩.৮
ওমা! তোর চরণে কি ফুল দিলে পূজা হবে বল।
রক্তজবা অঞ্জলি মোর হলো যে বিফল ॥

বিশ্বে যাহা আছে মা গো,
তাতেও পূজা হবে না কো;
তাই তো দুঃখে নয়নে মোর শুধুই আসে জল ॥
(রাঙা-জবা : ৮৬)

১৩.৯
এবার পূজার প্রদীপ হয়ে
জ্বলবে আমার দেবালয়ে,
জ্বালিয়ে যাবে গো
আর আঁচল দিয়ে ঢাকব না ॥
(কবিতা ও গান : ২০৩)

১৩.১০
সবার দেবতা তুমি
মোর পূজার থালিকা হতে নিয়েছ পূজা,
ভুলে গেছ পূজারিণীরে;
তব দেউল-দুয়ার হতে শূন্য হাতে
বারে বারে এসেছি ফিরে।
(কবিতা ও গান : ৫১৪)

১৪. লিখনকেন্দ্রিক ফোকলোর

লিখনকেন্দ্রিক ফোকলোর আর লোকসাহিত্যের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে। মুখে মুখে রচিত, প্রচলিত, প্রচারিত, সংরক্ষিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। লিখনপদ্ধতি আবিষ্কারের পর এসব লিখিতরূপে সংরক্ষণ করা হয়। তাই এসবই লিখনকেন্দ্রিক ফোকলোর নামে অভিহিত। এর প্রধান উপাদান পৌরাণিক কাহিনি। ভারতীয় উপমহাদেশে **রামায়ণ, মহাভারত** ছাড়াও লৌকিক দেব-দেবী বা কিংবদন্তি, **পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি,** জাতককথা, লোককথা, প্রবাদ, হেঁয়ালি ইত্যাদি লিখনকেন্দ্রিক লোকজ উপাদান। এসব যে কোনো দেশের লোকসংস্কৃতির উপাদান। শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টিকর্মে এসব পৌরাণিক বিষয় নতুনরূপে উপস্থাপন করেন। কখনও এসব লোকজ বিষয় অবলম্বন করে সৃষ্টি করে থাকেন তাঁদের শিল্প। তাতে ঐতিহ্যের প্রতি যেমন তাঁর মমত্ব প্রকাশিত হয়, নাড়ীর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়; তেমনি সৃষ্টিকর্ম হয় ঋদ্ধ। সমকালীন মানুষও খুঁজে পায় শক্তি সঞ্চয়ের প্রত্যয়। নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পারে তার অস্তিত্ব।

শৈশব কৈশোরে অবচেতনভাবে যে পুরাণকাহিনিতে অবগাহন করেছিলেন নজরুল তা নানা সম্প্রদায়ের হয়েও এক মিশ্র অস্তিত্বের সৃষ্টি করেছিল। তা আর কিছু নয় বাংলার ঐতিহ্য, লোকমানুষ-ঐতিহ্য। সে সংস্কৃতির মূল ভিত্তি সর্বধর্মসমন্বয়ের মহামন্ত্র মানবধর্ম। ঐতিহ্য অনুষঙ্গের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি মূলত তাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

নজরুল ছিলেন খাঁটি বাঙালি কবি। মিথ-পুরাণের ঐতিহ্যকে ধারণ করেই তিনি বাঙালি কবি হন নি, হয়েছেন সংগ্রামের সহযোদ্ধা। শোষণ-বঞ্চনাহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই নজরুল হাতিয়ার হিসেবে মিথ-পুরাণের ব্যবহার করেছেন :

> নজরুলের কবিতায় যে হিন্দু পুরাণ ও ইসলামি ঐতিহ্য সমান নৈপুণ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, নজরুল যে হাম্দ-নাত-ইসলামি গান আর শ্যামাসংগীত-বৈষ্ণবপদ রচনায় একই রকম পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছেন, সে তো তাঁর খাঁটি বাঙালিত্বের উত্তরাধিকার বহনেরই ফল। ... শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিশোষণ প্রতিরোধের সংগ্রামের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির খাঁটিত্ব রক্ষার পরিচয়ই বিধৃত। নজরুলও খাঁটি বাঙালি কবি হয়েছেন শুধু আবহমান বাঙালির সমন্বিত ঐতিহ্যকে আপন চৈতন্যে ধারণ করেই নয়, তার সকল প্রকার সংগ্রামের সহযোদ্ধা হয়েও। এ-রকমটি আর কোনো কবিই পারেন নি। এখানেই কবি নজরুলের অনন্যতা। (যতীন, ২০১১ : ১১৬)

নিচের গানগুলোতে বেশ কিছু মিথ-পুরাণের প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। ১৪.১ নম্বর গানে কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, যশোদা; ১৪.২ নম্বর গানে লক্ষ্মী, চাঁদ সওদাগর, হরি, নারায়ণ, সমুদ্রমন্থন; ১৪.৩ নম্বর গানে রাম, রাবণ, পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, যদুপতি, হরিশ্চন্দ্র, বিষ্ণু; ১৪.৪ নম্বর গানে কানাই, কুরুক্ষেত্র; ১৪.৫ নম্বর গানে কৃষ্ণ, রাধা, ব্রজধাম, মথুরা, দ্বারকা, বৃন্দাবন; ১৪.৬ নম্বর গানে বৃন্দাবন, গোপাল; ১৪.৭ নম্বর গানে সুবল, শ্রীদাম, গোপিনী, বৃন্দা, মথুরা ইত্যাদি পৌরাণিক চরিত্র, স্থান বা কাহিনির উল্লেখ রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয় নি এমনও বহু গান আছে যাতে পৌরাণিক প্রসঙ্গ এসেছে। শুধু ভারতীয় নয়; প্রতীচ্য, প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি মিথ-পুরাণের ব্যবহারে ঋদ্ধ নজরুলের সাহিত্য। লৌকিক অনেক বিষয় আছে যা হিন্দু ও মুসলিম উভয় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। সাহিত্যে এসবের ব্যবহারই নজরুলের ঐতিহ্যের প্রতি মমত্বের পরিচায়ক —

১৪.১
তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ।
টুটিল আগল, নিখিল পাগল,
সর্বসহা আজি সর্বজয়ী ॥
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়,
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে, আয়,
বসুধা-যশোদার স্নেহ-ধার উথলায়,
কাল্-রাখাল নাচে থৈ তাথৈ ॥
(চন্দ্রবিন্দু : ১৪)

১৪.২

লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে সাগর জলে সিনান করি'।
হাতে লয়ে সোনার ঝাঁপি, সুধার পাত্রে সুধা ভরি' ॥

আন্ মা আবার আঁচলে তোর নবীন ধানের মঞ্জরী সে,
টুনটুনিতে ধান খেয়েছে, খাজ্না মাগো দিব কিসে,
ডুবে গেছে সপ্ত ডিঙা, রত্ন-বোঝাই সোনার তরী ॥

ক্ষীরোদ-সাগর-কন্যা যে তুই, খেতে দে ক্ষীর সর মা আবার,
পান্তা লবণ পায় না ছেলে, রাজরানী মা'র এ কোন্ বিচার,
কার কাছে মা নালিশ করি, **অনন্ত শয়নে হরি** ॥

তোরও কি মা ধর্‌ল ঘুমে **নারায়ণের** ছোঁয়াচ লেগে,
বর্গী এল দেশে মা গো, খোকারা তোর কাঁদে জেগে,
তুই এসে তায় ঘুম পাড়া মা হাতে দিয়ে ঝিনুক কড়ি ॥

কোন্ দুখে তুই রইলি ভুলে বাপের বাড়ি অতল-তলে,
ব্যথার সিন্ধু মন্থন শেষে, ভর্‌ল যে দেশ হলাহলে,
অমৃত এনে সন্তানে বাঁচা, মা তোর পায়ে ধরি ॥
(সুর-সাকী : ৬৭)

১৪.৩

চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।
আজিকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায় ॥

অবতার শ্রীরাম যে জানকীর পতি
তারো হ'ল বনবাস রাবণ করে দুর্গতি।
আগুনেও পুড়িল না ললাটের লেখা হায় ॥

স্বামী পঞ্চ পাণ্ডব, সখা কৃষ্ণ ভগবান,
দুঃশাসন করে তবু দ্রৌপদীর অপমান।
পুত্র তার হ'ল হত যদুপতি যার সহায় ॥
মহারাজ শ্রীহরিশ্চন্দ্র রাজ্যদান ক'রে শেষ
শ্মশান-রক্ষী হয়ে লভিল চণ্ডাল বেশ।
বিষ্ণু-বুকে চরণ-চিহ্ন, ললাট-লেখা কে খণ্ডায় ॥
(বন-গীতি : ৪২)

১৪.৪

নাচিয়া নাচিয়া এস নন্দ-দুলাল।
এস নূপুর রুণুঝুণু পায়ে,
এস প্রেম-যমুনা নাচায়ে

এস বেণু বাজায়ে এস ধেনু চরায়ে
এস কানাই রাখাল ॥

. . .

এস ঝুলনে হোরীতে রাসে,
কুরুক্ষেত্র-রণে, এস প্রভাসে,
(গীতি-শতদল : ৫৯)

১৪.৫

ওরে নীল-যমুনার জল বল্ রে, মোরে বল্ —
কোথায় ঘন-শ্যাম আমার কৃষ্ণ ঘন-শ্যাম।
আমি বহু আশায় বুক বেঁধে যে এলাম **ব্রজধাম ॥**

তোর কোন্ কূলে কোন্ বনের মাঝে
আমার কানুর বেণু বাজে,
আমি যেথায় গেলে শুনতে পাবো **'রাধা' 'রাধা'** নাম ॥

আমি শুধাই **ব্রজের ঘরে ঘরে — কৃষ্ণ কোথায় বল্,**
কেন কেউ কহে না কথা, হেরি সবার চোখে জল!

বল্ রে, আমার শ্যামল কোথায় —
কোন্ মথুরায় কোন্ দ্বারকায়,
বল্ যমুনা বল্ —
বাজে **বৃন্দাবনের** কোন্ পথে তার নূপুর অভিরাম ॥
(কবিতা ও গান : ৬৪৫)

১৪.৬

গোঠের রাখাল, বলে দে রে
কোথায় বৃন্দাবন।
যেথায় রাখাল রাজা গোপাল আমার
খেলে অনুক্ষণ ॥
(কবিতা ও গান : ৬৫২)

১৪.৭

সুবল সখা!
শ্রীদাম দেখেছে তাঁরে রাখাল দলে;
গোপিনীরা দেখিয়াছে যমুনার জলে;
বাঁশরি দেখেছে তাঁরে কদম-শাখায়;
কিশোরী দেখেছে তাঁরে ময়ূর-পাখায়।
বৃন্দা এসেছে দেখে, রাজা **মথুরায়**
জানি না কোথায় সে —
(কবিতা ও গান : ৬৯৪)

১৫. লোকখেলাধুলা

গ্রামবাংলায় বিভিন্ন ধরনের খেলার প্রচলন রয়েছে। এর অনেকগুলো বড়দের খেলা, অনেকগুলো ছোটদের খেলা। এগুলোর নিজস্ব কিছু রীতি-পদ্ধতি আছে। অঞ্চলভেদে এর তারতম্যও ঘটে থাকে। এগুলো গ্রামের কৃষক, শ্রমিক এক কথায় শ্রমজীবী লোকমানুষের মনোরঞ্জনের বিষয়। এসব খেলাই লোকখেলা। এ খেলাগুলোর অধিকাংশই বিপজ্জনক। এজাতীয় খেলায় তেমন কোনো বিশেষ উপকরণের প্রয়োজন পড়ে না। সামান্য যা কিছু প্রয়োজন তা নিজেরাই তৈরি করে নেয়। তাতে লোকমানসের ছাপ থাকে। কোনো কোনো খেলার সাথে ছড়া কাটা বা গানের প্রসঙ্গও জড়িত। এসব খেলা ঐতিহ্যকে ধারণ করে। এক এক জনপদে এক এক ধরনের খেলার প্রচলন থাকে। সাধারণত অবসরকালীন সময়ে গ্রামের লোকেরা এসব খেলা খেলে। হাডুডু, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, ডাংগুলি, লাঠিখেলা, কানামাছি, ঘুঁটিখেলা, বাঘবন্দি, নৌকাবাইচ, ষাড়ের লড়াই, ভালুকনাচ, বাঁদরনাচ, লোকসার্কাস ইত্যাদি লোকখেলাধুলার প্রচলন রয়েছে গ্রামবাংলায়। নিচের গান দু'টোতে সাপ খেলা, বাঁদর নাচের প্রসঙ্গ রয়েছে —

১৫.১
বাঁকা ছুরির মতন বেঁকে
উঠলো যে তোর আঁখি রে।
ওরে বেদের দুলাল আমার সাথে
সাপ খেলাবি না কি রে ॥
. . . . . .
তোর জোড়া ভুরুর ধনুক আমি চিনি,
পাখি আমি নই, বেদিয়া, আমি যে সাপিনী।
(কবিতা ও গান : ৮২০)

১৫.২
শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে
(তাই) মাঠে ঘাটে বেড়াস ধেয়ে।
. . . . . .
তুই দানব ধরে **বাঁদর নাচাস**
কাজ নাই তোর খেয়ে-দেয়ে ॥
(বন-গীতি : ৪৮)

১৬. লোকমেলা

লোকমেলা গ্রামীণ সমাজের চিত্তবিনোদনের উল্লেখযোগ্য একটি উপায়। কোনো একটা উপলক্ষ নিয়ে এক স্থানে একদিন বা একাধিক দিন ধরে এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। সে উপলক্ষে মুড়ি-মুড়কি-মণ্ডা-মিঠাই থেকে শুরু করে চানাচুর, খিলিপান, ফিতা, চুড়ি, বাঁশি ও খেলনাসহ নানা রকম প্রসাধনীর দোকান বসে যায়। বায়োসকোপ, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাস, কবির আসর ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শব্দ ও গন্ধে চারদিক উৎফুল্ল থাকে। রঙ-বেরঙের পণ্য-সামগ্রীতে মেলার মাঠ পরিপূর্ণ থাকে।

গ্রামদেশে প্রচলিত পৌষমেলা, বৈশাখীমেলা, চড়কমেলা, রথের মেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য লোকমেলা। এসব মেলার নিজস্ব একটা চরিত্র আছে। এতে প্রাণের ছোঁয়া থাকে। সে কারণে বহু আত্মীয়-পরিজনের সমাগম ঘটে। মেয়ে-জামাই বেড়াতে আসে। বাড়ি বাড়ি উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। পারিবারিক বা সামাজিকভাবে মানুষ একে অন্যের সান্নিধ্য লাভ করে। লোকমেলাগুলো সবার মিলনতীর্থ। পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি এসব মেলার উদ্দেশ্য। 'মেলা বা বারোয়ারিতে গ্রামাঞ্চলে সই এবং ধরমকুটুম পাতানোর হিড়িক। অন্তর যখন উদ্বেল হয় মানুষ তখন অনাত্মীয়ের মধ্যেও আত্মীয় বা পরমজনকে খুঁজে পায়।' (প্রবোধ, ২০০৩ : ৫)

মেলায় যাবার জন্যে বাচ্চারা, বিশেষ করে মেয়েরা সেজেগুজে তৈরি হয়। প্রয়োজনীয় প্রসাধনীর অভাবে তারা মানও করে। আবার খুব অল্পেতেই তুষ্ট হয়। সবার রঙে রঙ মেশানোতেই যেন আনন্দ লোকমানুষের। এসব লোকজ অনুষঙ্গের প্রকাশ নিচের গানটিতে। নজরুলের এ বিখ্যাত গানটিতে দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রাম-বাংলার লোকজীবনের পরিচয় বিধৃত। এর মধ্য দিয়ে নজরুলের লোকমানসের পরিচয় পাওয়া যায় —

হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে এনে দে নৈলে বাঁধব না বাঁধব না চুল।
কুস্‌মি রং শাড়ি চুড়ি বেলোয়ারি
কিনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে
বাব্‌লা ফুল আমের মুকুল ॥
তিরকুট পাহাড়ে শাল বনের ধারে
বস্‌বে মেলা আজি বিকালবেলায়,
দলে দলে পথে চলে সকাল হতে
সাঁওতাল সাঁওতালনী নূপুর বেঁধে পায়,
যেতে দে ঐ পথে **বাঁশি শুনে শুনে পরান বাউল** ॥

মহুয়া কুঁড়ির মালা গেঁথেছি নিরালা
তুহার তরে,
মনের আদর মেখে পিয়াল পাতা ঢেকে
রেখেছি ঘরে।
পলার মালা নাই,
কি যে করি ছাই,
গাঁথব মালা রে, এনে দে এনে দে এনে দে রে সিঁয়া-কূল ॥
(কবিতা ও গান : ৩৫)

১৭. লোকবাদ্যযন্ত্র

লোকজীবনের সাথে লোকবাদ্যযন্ত্রের বিশেষ সম্পর্ক আছে। লোকায়ত সমাজের নানা ক্রিয়া-কর্ম, আচার-প্রথা, পালা-পার্বণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নাচ-গানের সাথে লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল। বিশেষ করে আদিম সমাজে বা আদিবাসী সমাজে বা

গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে নিজস্ব উদ্ভাবিত যে বাদ্যযন্ত্রগুলোর প্রচলন ছিল, তাই লোকবাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রগুলোর বেশির ভাগই শিল্পী নিজেই তৈরি করতেন। প্রাচীন লোকবাদ্যযন্ত্রগুলোর অনেকগুলোই আধুনিক কালেও পরিবর্তিত রূপে হলেও বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সিঙ্গা, বাঁশি, মাদল, মৃদঙ্গ, কাঁসি, ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, গুপী ইত্যাদি লোকবাদ্যযন্ত্রগুলো প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অনেক বাদ্যযন্ত্র রূপান্তরিত হয়ে অন্যরকম হয়েছে বা অন্য নাম গ্রহণ করেছে। লোকমানুষ তাদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে লোকবাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করত এবং বর্তমানেও করে। 'বিয়ের আনন্দ-উৎসবে বা যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত বাজনার প্রচলন ছিল, তাকে লোকবাদ্যযন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়, যেমন — সিঙ্গা, শঙ্খ, ভোরঙ্গ, সানাই, ডম্প, ঢোল, মাদল, মৃদঙ্গ, ডেউরী, ঝাঝরী, কাঁসী, বাঁশী, ডহর, ঢেমচা, দগর প্রভৃতি। (খালেক, ১৯৮৫ : ৫৪৭)

নজরুলের বহু গানে লোকবাদ্যযন্ত্রের প্রসঙ্গ রয়েছে। এর মাধ্যমে লোকমানুষ ও লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর মমত্বের প্রকাশ ঘটেছে। বাংলার লোকসংগীতে লোকবাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের বিকল্প নেই। নজরুলের লোকসংগীতেও লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার অনস্বীকার্য। নিচে বেশ কয়েকটি গানের উল্লেখযোগ্য কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হল যাতে লোকবাদ্যযন্ত্রের প্রসঙ্গ রয়েছে। মৃদঙ্গ (১৭.১, ১৭.২, ১৭.৪ ও ১৭.৭ নম্বর গান), বাঁশি (১৭.৩, ১৭.৮ ও ১৭.১১ নম্বর গান), মাদল (১৭.৩ ও ১৭.১১ নম্বর গান), নৌবত (১৭.৫ ও ১৭.৮ নম্বর গান), একতারা (১৭.৬ ও ১৭.১২ নম্বর গান), ডুগডুগি (১৭.৯ নম্বর গান), সানাই (১৭.১০ নম্বর গান), কাঁসর (১৭.১০ নম্বর গান), ঢোল (১৭.১০ ও ১৭.১১ নম্বর গান), ঝাঁঝর, খরতাল, করতাল (১৭.১৩ নম্বর গান) ইত্যাদি লোকবাদ্যযন্ত্রের প্রসঙ্গ রয়েছে নজরুলের নিচের গানগুলোতে —

১৭.১
দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ
অশান্ত অম্বর-মাঝে
মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
(বুলবুল ১ম খণ্ড : ১১)

১৭.২
অধীর অম্বরে **গুরু গরজন মৃদঙ্ বাজে**
তালীবন হানে তালি, ময়ূরী ইশারা হানে,
আসন পেতেছে ধরা মাঠে মাঠে চারা-ধানে।
(বুলবুল ১ম খণ্ড : ৩১)

১৭.৩
কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো।
খোঁপা খুলে কেশ হ'ল বাউল লো ॥
পথে কে বাজালো **মোহন বাঁশি**
ঘরে ফিরে যেতে হ'ল ভুল লো।
কে নিল কেড়ে তোর পৈঁচি চুড়ি
বৈঁচি মালায় ছি ছি খোয়ালি কুল লো ॥

ও সে বুনো পাগল
পথে **বাজায় মাদল,**
পায়ে ঝড়ের নাচন
শিরে চাঁচর চুল লো ॥
(মহুয়ার গান : ১)

১৭.৪

পিও শারাব পিও!
দূরে **মৃদং** বাজে
শুধু ফাঁকা আওয়াজে তোর মন ভোলাতে ॥
(নজরুল গীতিকা : ২)

১৭.৫

রংমহলের রংমশাল মোরা আমরা রূপের দীপালি
রূপের দেউলে আমি পূজারিণী,
রূপের হাটে মোর নিতি বিকিকিনি,
নৌবতে আমি প্রাতে আশাবরী,
আমি সাঁঝে কাঁদি ভূপালী ॥
(নজরুল গীতিকা : ২৫)

১৭.৬

ওহে রাখাল-রাজ!
তোমার পায়ের নূপুর আমায় দিয়ে
ঘুরাও পথে-ঘাটে নিয়ে,
বেড়াই বাউল **একতারা** বাজিয়ে হে,
তোমার ভুবন-নাটে নেচে বেড়াই
ভুলে শরম-ভরম-লাজ ॥
(চন্দ্রবিন্দু : ৫)

১৭.৭

নাচন লাগে ঐ তরুলতায় পাতায় ফুলে।
মৃণাল-তনু কমল নাচে এলো খোঁপায় নীল জলে,
ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজায় নির্ঝর পাষাণ-তলে।
বাদ্‌লা হাওয়ায় তাল্‌বনা ঐ বাজায় চটুল্ দাদ্‌রা তাল,
নদীর ঢেউ-এ **মৃদং** বাজে, পানসী নাচে টালমাটাল।
নেচে নেচে গ্রহতারা দিশাহারা নটরাজের নাট-দেউলে ॥
(সুর-সাকী : ৭৮)

১৭.৮

র'বে না এ বৈকালী ঝড় সন্ধ্যায়।
নৌবতে বাজিবে গো ভীম-পলশ্রী,
উদাস পিলুর সুরে ঝুরিবে **বাঁশি,**
বাজিবে নূপুর হ'য়ে তটিনী ও পায় ॥
(জুলফিকার ১ম খণ্ড : ২৪)

১৭.৯
শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে
(তাই) মাঠে ঘাটে বেড়াস ধেয়ে।
. . . . . .
ডুগডুগি ঐ বাজায় মহেশ
ক্ষ্যাপা বেটা গাঁজা খেয়ে,
(বন-গীতি : ৪৮)

১৭.১০
মা এসেছে মা এসেছে
উঠ্‌ছে কলরোল।
দিকে দিকে উঠ্‌ল বেজে
সানাই কাঁসর ঢোল ॥
(গানের মালা : ৭০)

১৭.১১
বেদিয়া বেদেনী ছুটে আয় আয় আয় আয়।
ধাতিনা ধাতিনা তিনা **ঢোলক মাদল বাজে**
বাঁশিতে পরান মাতায় ॥
(বুলবুল ২য় খণ্ড : ৬০, কবিতা ও গান : ৮৪২)

১৭.১২
আমি বাউল হলাম ধূলির পথে
লয়ে তোমার নাম
আমার **একতারাতে** বাজে শুধু
তোমারই গান শ্যাম ॥
(কবিতা ও গান : ৬৪৪)

১৭.১৩
আজি মনে মনে লাগে হোরি
আজি বনে বনে জাগে হোরি ॥
আজি **ঝাঁঝর খরতাল করতাল** বাজে।
বাজে কঙ্কণ চুড়ি মৃদুলিয়া বাজে।
সচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে
প্রেম-উল্লাসে শ্যামল গোরী ॥
(কবিতা ও গান : ৪৮০)

১৮. লোকনৃত্য

নৃত্য প্রাচীনতম শিল্পচর্চার মাধ্যম। আদিম মানুষ শিকারে যাবার প্রাক্কালে কিংবা শিকার শেষে নৃত্যের আয়োজন করত। আনন্দ আয়োজনে মানুষ খুশিতে নেচে ওঠে। কর্মমুখর সমাজে যৌথ নৃত্যের প্রচলন বেশি। শ্রমজীবী মানুষ অবসরের কালে এরকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মক্লান্তি দূর করে। খুশিতে মেতে থাকে। লোকসমাজে প্রচলিত নৃত্যই

লোকনৃত্য। এর সাথে ধর্ম ও যাদুবিদ্যার সম্পর্ক রয়েছে। 'লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম প্রাচীনতম ঐতিহ্য হলো নৃত্য এবং নৃত্য জন্মের মুহূর্ত থেকে ধর্ম ও যাদুবিদ্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। (বিমল, ২০০১ : ১৭৫) নৃত্য পৃথক ও স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৃত্য সংগীতের সাথে পরিবেশিত হয়। সঙ্গত বা গান ছাড়া নৃত্য যেন অসম্পূর্ণ। লোকনৃত্যের সাথে বাদ্য নয়ত গান পরিবেশিত হয়ে থাকে :

> বাংলা লোকনৃত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তা কণ্ঠসঙ্গীতযোগে সম্পন্ন হয়। অধিকাংশ নাচ গানের সাথে পরিবেশিত হয়। বাউল, জারি, কীর্তন প্রভৃতি লৌকিক অনুষ্ঠানে গান ও নাচ অবিভাজ্য অঙ্গ। বাউলরা গান করতে করতে নাচে; বৈষ্ণবরা নাচতে নাচতে কীর্তন করে। মুসলমান শিয়ারা মর্সিয়া গাইতে গাইতে জারিনাচ নাচে। (ওয়াকিল, ১৯৭৪ : ৯৩)

ব্রতচারীদের বিশ্বাস 'নৃত্য ছাড়া কৃত্য নেই'। সমাজজীবনে নৃত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। আর লোকনৃত্য যে কোনো জাতির ঐতিহ্যের বিষয়। নৃত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গুরুসদয় দত্ত তাঁর 'ঐক্য বিজ্ঞান' প্রবন্ধে বলেছেন :

> মানবজাতিকে সমাজে একতাবদ্ধ করবার ক্ষেত্রে এবং তাদের মধ্যে নৈতিক জীবন প্রবর্ত্তনের ক্ষেত্রে নৃত্যের প্রভাব সবিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহার প্রভাব দুইদিক দিয়ে দেখা যায়। প্রথমতঃ মানব-সমাজে নৃত্যের ভিতর দিয়ে কর্ম্মে ঐক্য স্থাপন ও ক্রমবিবর্ত্তনে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী আনবার সহায়তা হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ – মানবজাতি নৃত্যের সহায়তায় তার স্বাভাবিক ভীরুতা প্রকৃতিকে জয় করে প্রাণে সাহস আনতে সমর্থ হয়েছে। এরূপ জীবনের সকল সমবায়মূলক কর্ম্মাবলীতে আমরা নৃত্যের প্রভাব লক্ষ্য করতে সক্ষম হই। মানবের সকল শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলিই নৃত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নৃত্যই মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতে শিখিয়েছে। (সৈকত, ১৯৯৪ : ১২৮)

নিচের গানগুলোতে লোকনৃত্যের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম গানটিতে আদিবাসী বা সাঁওতালি নাচ এবং দ্বিতীয় গানটিতে কীর্তনীয়াদের নাচের প্রসঙ্গ আছে। মাদলের তালে তালে আদিবাসী মেয়েদের অর্থাৎ সাঁওতাল নারীদের অঙ্গ দুলে ওঠার কথা বলা হয়েছে এ গানে। কীর্তন গানে যে ধরনের নাচ থাকে তার উল্লেখ রয়েছে দ্বিতীয় গানটিতে। এসবই লোক-ঐতিহ্যের বিষয়। এসব নৃত্যে আটপৌরে একটা ঢং আছে যা একেবারেই দেশীয়। এবং শিল্পগুণেও তা অনন্য। লোকসংস্কৃতির এসব অনুষঙ্গ ব্যবহারে নজরুলের গান হয়েছে লোকমানুষের প্রাণের সম্পদ। মণি-মুক্তার মতো ছড়িয়ে থাকা এসব লোকজ উপাদান নজরুল সংগ্রহ করে স্থান দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে —

১৮.১
মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ ওঠে দুলে,
দোল্ লাগে শাল-পিয়াল বনে নোটন খোঁপার ফুলে।
মহুয়া বনে লুটিয়ে পড়ে মাতাল চাঁদের হাসি লো ॥
(বুলবুল ২য় খণ্ড : ৭২)

১৮.২
নাচিয়া নাচিয়া এস নন্দ-দুলাল।
এস নূপুর রুণুঝুণু পায়ে,

এস প্রেম-যমুনা নাচায়ে
এস বেণু বাজায়ে এস ধেনু চরায়ে
এস কানাই রাখাল ॥
(গীতি-শতদল : ৫৯)

লোকসংস্কৃতির বিপুল ঐশ্বর্যকে নজরুল সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে ধারণ করেছিলেন, যেভাবে লোকজীবনে প্রবাহিত রয়েছে। বাংলার লোকজ বিষয়ের অনেক কিছু এখন বিলুপ্ত প্রায়, এবং অনেক বিষয় টিকে থাকলেও তা এখন নাগরিক সভ্যতার দৌরাত্ম্যে অবহেলিত, অচল ভাবনার মধ্যে আটকে আছে। কিন্তু বাঙালির শিষ্টাচার, শিক্ষা ও নন্দন ভাবনার সাথে এর সম্পর্ক অনেক গভীরে। লোকসংস্কৃতি নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা হচ্ছে, কিন্তু নজরুলের গানের ভিতরে কিরূপ সার্থকভাবে এই অধ্যায় লুকিয়ে রয়েছে, তা মনোযোগের সাথে অনুধাবন করতে না পারলে একদিকে বাংলার জীবন ও কৃষ্টির গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, অপরদিকে নজরুলের প্রকৃতি ও দেশজভাবনাকেও গুরুত্বের সাথে দেখার সক্ষমতা জন্মায় না। নজরুল কতটা মাটিবর্তী ছিলেন এই গবেষণায় বিভিন্ন লোক উপদানের সাথে নজরুলের আত্মিক সম্পর্ক দেখেই তা বুঝে উঠা সম্ভব। নজরুলের এই জোরালো ধরনটাই বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছে, নজরুলকেও কালোত্তীর্ণ করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আশুতোষ ভট্টাচার্য (২০০৫)। *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, ইন্ডিয়া : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

আসাদুল হক সম্পাদিত (১৯৯৯)। *সুধীজনের দৃষ্টিতে নজরুল সঙ্গীত*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ (১৯৭৪)। *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

করুণাময় গোস্বামী (১৯৯০)। *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

প্রবোধকুমার ভৌমিক (২০০৩)। *লোকসমাজ ও সংস্কৃতি*, লোকসংস্কৃত ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ।

বরুণকুমার চক্রবর্তী (২০০৩)। *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

বিমল গুহ (২০০১)। *আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজ উপাদান — জসীমউদ্‌দীন-জীবনানন্দ দাশ-বিষ্ণু দে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৫)। *নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

মজহারুল ইসলাম (১৯৯৩)। *ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল খালেক (১৯৮৫)। *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ নূরুল হুদা, সুধীন দাশ, রশিদুন নবী সম্পাদিত (১৯৯৭)। *নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি সংগ্রহ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

মোঃ হারুন অর রশীদ (১৯৯৬)। *নজরুল সাহিত্যে ধর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

যতীন সরকার (২০১১)। *বাংলা কবিতার মূলধারা এবং নজরুল*, রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত (২০০১)। *The Rebel Poet*। নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

সৈকত আসগর (১৯৯৪)। *গুরুসদয় দত্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (১৯৮৮)। *ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।